

সমতলে বিছানো হির পৃথিবী।

(২য় খন্ড)

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী।

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী।

(২য় খন্ড)

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী।

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ।

## ভূমিকা:

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর ১ম খন্ডতে শাইখ আসাফির কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল দিয়ে প্রমান করেছেন যে পৃথিবী সমতল ও স্থির। বলাকার ও ঘূর্ণায়মান নয়। যারা ওটা পড়েন নি তারা নিচের লিংক থেকে পড়ে নি।

Blog link: <https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/02/blog-post.html>

PDF link:

<https://drive.google.com/file/d/13S5cIIzdY62BZdbDZ305UWR9E9EaCiXh/view?usp=sharing>

এখন আপনাদের হাতে আল্লাহর ইচ্ছায় ২য় খন্ড তুলে দিচ্ছি। এখানে সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ইসলামী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই খন্ডের বেশিরভাগ লিখাই বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি সংকলন করেছি। এবং প্রয়োজন মতো সম্পাদনা করেছি। অনেক জায়গায় আমি নিজেই লিখতে বাধ্য হয়েছি, উপযুক্ত আটিকেল না পাওয়ায়। তবে এই সংকলন ও সম্পাদনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, একটু একটু করে এটাকে সাজাতে হয়েছে। তাই ভুল ত্রুটি থাকাটা খুব স্বাভাবিক। ভুলগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

Rooh Mahmood

## সূচিপত্র

ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি এবং পৃথিবীর বয়স। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি।

পবিত্র কাবা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রথম জমিন।

৭ম আসমানের বায়তুল মামুর থেকে কিছু পড়লে কাবার উপরে পড়বে।

সাত জমিন, আসমান ও সমুদ্র নিয়ে অপবিজ্ঞানের মিথ্যাচার।

সূর্যের গতিপথ এবং আমেরিকার সাথে দিন রাত্রির পার্থক্য।

সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট:

ইসলামের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ: (সকল বিভ্রান্তির নিরসন)।

চাঁদ সূর্য পৃথিবী একই সরলরেখায় এসে গেলে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয় এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা।

সাইন্টিস্টরা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ এর সময়কাল আগে থেকে কিভাবে বলে? তাহলে কি তারা চাদ সূর্যের মঞ্জিলগুলো সম্পর্কে অবগত?

সূর্য কোন আকাশে অবস্থিত?

**\*সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী স্থির।\***

পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে- সাংবাদিক সম্মেলনে সুশান্ত দেবের দাবী।  
সূর্য কোথায় এবং কিভাবে, উদয় হয় এবং অস্ত যায়?

পৃথিবী সমতল হলে দিনের বেলা আমরা কেন সূর্যকে দেখতে পাই না।

যারা পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্যের আবর্তনকে অবিশ্বাস করে, তাদের ব্যাপারে আরব শায়েখদের বক্তব্য।

চলমান সূর্যের গতি রোধ করার তিনটি ঘটনা।

আল কুরআনে “দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম” সংক্রান্ত তথ্য।

সূরা রহমানে ২টি পূর্ব( উদয়াচল) ২টি পশ্চিম( অস্তাচল) বলার রহস্য।

সূর্য কি চক্রাকারে ঘুরছে, নাকি দিন শেষে ডুবে যাচ্ছে?

পৃথিবী থেকে প্রচলিত সূর্যের দূরত্ব নিয়ে, গ্লোব আর্থারদের দলিল খণ্ডন!

"চাঁদের নিজস্ব আলো নেই"এই ধারণা কবেকার?

পূর্ণিমার চাদ (নিজস্ব আলোয় আলোকিত) রাজধানীর ঢাকার আকাশে।

সূর্যের মঞ্জিল চাঁদের মত নয় বিধায় সূর্যদোয়ের দেশ আছে,  
কিন্তু চন্দ্রদোয়ের নির্দিষ্ট কোন দেশ নেই।

আকাশের দূরত্ব এবং লো আর্থ আরবিটে রকেটের বাধাপ্রাপ্তি নিয়ে একটি বিশ্লেষণ।

আকাশ-সুউচ্চ জমাট ঢেউ ও সুরক্ষিত ছাদ।

ইসলামের দৃষ্টিতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি।

সমতল ও স্থির পৃথিবীতে ঋতুবৈচিত্র্য কিভাবে হয়?

ইসলামের দৃষ্টিতে আগ্নেয়গিরি (এক টুকরো জাহান্নাম) ।

ইসলামের দৃষ্টিতে জোয়ার ভাটা।

ছায়াপথ ও রংধনু।

সমতলে বিছানো পৃথিবীতে এস্টরয়েড (গ্রহানু বা উল্কা) ।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, টর্নেডো, অগ্নিকান্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ইত্যাদি) ।

অ্যান্টার্কটিকার সবুজ বরফ এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তের আলোচনা।

সমতলে বিছানো পৃথিবীতে নর্থ ও সাউথ পোল, স্টার ট্রেইলস, অরোরা লাইট & আলাস্কা।

রাশিয়া কেন আলাস্কা বিক্রয় করেছিলো? এবং সমতল পৃথিবীতে এসবের ব্যাখ্যা।

### ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি এবং পৃথিবীর বয়স। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিঃ

**আল্লাহ তায়ালা বলেন :**

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এভাবে যে রাত্রি দিনকে দ্রুত ধরে ফেলো। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র নিজ আদেশের অনুগামী। জেনে রেখো, সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা তাঁরই কাজ। বড় বরকতময় আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (সূরা : আরাফ, আয়াত : ৫৪)

**আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টির কারণঃ**

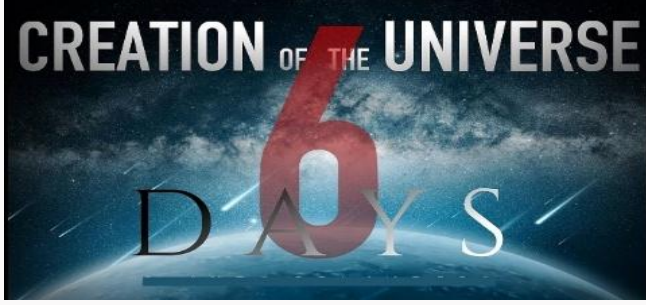


এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কোরআনেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে এ কথা বারবার বলা হয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কী? প্রখ্যাত তাফসিরবিদ হজরত সাইদ ইবনে জুবারের (রা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ' আল্লাহ তাআলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে একনিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে : চিন্তাভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা সহকারে কাজ করা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়; আর তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। ( তাফসিরে মাজহারি)

**আসমান- জমিন, গ্রহ- নক্ষত্র সৃষ্টির আগে দিবারাত্রির পরিচয়:**

দ্বিতীয়ত, এখানে এ প্রশ্নও হতে পারে যে সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাতের হিসেবে করা হয়। তাহলে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির আগে যখন চন্দ্র- সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কী হিসেবে নিরূপিত হলো? এর জবাবে কোনো কোনো তাফসিরবিদ বলছেন, ' ছয় দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়।' তবে এ প্রশ্নের পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত, এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহ তাআলার কাছে দিবারাত্রির পরিচয়ের অন্য কোনো লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে। তেমন জানাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না। উদাহরণত পরকালের দিন

সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে সেখানে এক দিন এক হাজার বছরের সমান হবে।



সে ছয় দিন কোনটি?

বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে যে ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা রবিবার থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ করা হয়নি। এ ছয় দিনের কার্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূরা হা-মিম সিজদার নবম ও দশম আয়াতে রয়েছে। রবি ও সোমবার- এ দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার ভূমণ্ডলের সাজসরঞ্জাম- পাহাড়, নদী, খনি, বৃক্ষ, সৃষ্টজীবের পানাহারের বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাত আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সূরা হা-মীম আশ্বেসজদাহর ৯ থেকে ১২ আয়াতসমূহে (৪১: ৯-১২) আল্লাহ বলেন,

"হে নবী! এদের কে বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ যিনি ‘পৃথিবীকে’ দুই দিনে বানিয়েছেন? তিনি-ই বিশ্বজগতের সকলের রব্বা (১০) তিনি পৃথিবীর বুকে পাহাড় সংস্থাপন করে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সমন্বিত করেছেন আর তাতে সব প্রার্থীর জন্য চাহিদানুযায়ী সঠিক পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী জমায়েত করে রেখেছেন। এই সব কাজ



চারদিনে সম্পন্ন হয়েছে (১১) অতঃপর তিনি আকাশ মন্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন তা শুধু তখন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আসমান ও জমিনকে বল্লেন: ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ করো" উভয়ই বলল: আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই (১২) তারপর তিনি দুই দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রতি আসমানে তাঁর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করলেন। আর দুনিয়ার (নিকটতম) আসমানকে আমরা প্রদীপসমূহ দারা সুসজ্জিত করলাম এবং তাকে পূর্ণনভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এই সব কিছুই এক মহাপরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তার পরিকল্পনা" ( তাফসিরে মা' আরেফুল কোরআন ও ইবনে কাছির অবলম্বনে)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম, এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে ৬ দিনে অর্থাৎ আমাদের ৬ হাজার বছরে।

এর পর পৃথিবী কি অবস্থায় এবং কতদিন এভাবে ছিল, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তারপর আল্লাহ জিনদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দিলেন। জিনেরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছিলো, সেটাও আল্লাহই ভালো জানেন। তবে নিচের লিখাগুলো থেকে আমরা কিছুটা ধারণা পেতে পারি।

জ্বীনদের ৫ম বাদশাহ হামুচের পুত্র খবিচের ঔরসে এবং তার কন্যা নিলবিসের গর্বে ইবলিসের জন্ম। খবিচ ছিল সিংহের মতো শক্তিশালী এবং স্বভাব ছিল বাঘের ন্যায়। নিবলিচ ছিল ভীষন ধূর্ত। হিংসুক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ইবলিস ছিল অসাধারণ প্রতিভাবান, খুবই সুদর্শন, সাহসী, শক্তিশালী এবং এক ঘুঁয়ে। ইবলিসের গৃহ শিক্ষক ছিল শারবুক- যার ছিল ২৬ হাজার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। ইবলিসের মত

মেধাবী ছাত্র তার শিক্ষা জীবনে কোথাও পায়নি। তবে সে খবিসকে বলেছিল, ছেলের প্রতি খেয়াল রেখ। সে জীবনে বিরাট কিছু একটা হবে।

সময়ের বিবর্তনে জ্বীনদের নোংরা আচরনে অসন্তুষ্ট হয়ে মহান আল্লাহ পাক হামুচের বংশ ধ্বংস করার নির্দেশ দান করলে ফেরেস্তারা তাই করেন। তবে ইবলিসের দেহ বর্ণ এবং জ্ঞানের গভীরতা দেখে তাকে ফেরেস্তারা রেখে দেয়। সহসাই ইবলিস তার আচরনে ফেরেস্তাদের মন জয় করে। ফেরেস্তারা ইবলিসকে ‘খাশেন’ নামক সনদ দিলেন। যার অর্থ মহাজ্ঞানী। এরপর ফেরেস্তাগণ তাকে আসমানে তুলে নিলেন। দ্বিতীয় আসমানে ইবলিসের ইবাদত বন্দেগীতে একাগ্রতা দেখে ফেরেস্তাগণ মুগ্ধ হয়ে তাকে ‘আবেদ’ সনদ দান করলেন। এরপর তার উন্নতি ঘটে তৃতীয় আসমানে। প্রতি আসমানেই তাকে একহাজার বছর ইবাদত করতে হতো এবং সে তাই করতো। এভাবে সে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আসমানে পৌঁছে।

ইবলিস কাহিনী মানব জাতির জন্য চাম্ফুস উদাহরন। যার বিবেক আছে সেই বুঝতে পারে বাদশাহ হামুচের ছেলে মেয়ের ঘরে জন্মালেও তার মা-বাবা ছিল নিষ্ঠুর, কুচক্রি এবং দুশ্চরিত্র। সুতরাং অপাত্রে জন্ম হলে তার কার্যাবলীও সুন্দর এবং সার্বজনীন হয় না। কালের আবর্তনে জাতক জন্মদাতা ও জন্ম দাত্রীর চরিত্রকেই অনুসরন করে থাকে। অহংবোধ মানুষের অধঃপতনের কারন। তাই ইবলিসের ছয় লক্ষ বছরের ইবাদতের পরিনিতি জাহান্নাম। অপরের ক্ষতির চিন্তা এবং চেষ্টা একজন মানুষকে কোন নরকে নিয়ে যেতে পারে ইবলিস তার জ্বলন্ত উদাহরন। সুতরাং হে মানুষ, সাবধান! জ্বীন ও ফেরেস্তাকুলের প্রভাবশালী নেতা ইবলিসের জীবন হতে

আসুন শিক্ষাগ্রহণ করি। মানুষ হই। আল্লাহ আমাদের সংপথ প্রদর্শন করুন এবং  
আমরা তা মেনে চলতে সংকল্পবদ্ধ হই। আমিন।

লিখাটি শয়তানের সাক্ষাতকার (১ম পর্ব) থেকে নেয়া হয়েছে। লেখকঃ মুনিরুল  
ইসলাম।

উপরে একটা বিষয় খেয়াল করুন। শয়তান ৬ লক্ষ বছর এবাদত করেছিলো। নিচে এ  
প্রসঙ্গে আরও একটি লিখা দেখুন।

ইবলিশ শয়তান আল্লাহকে ৬ লক্ষ বছর ইবাদত করেছিল, আর যখন তাকে  
শয়তান বলে আরশ থেকে বের করে বা নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছিল তখন সে বলেছিল,  
আমি যত বছর আপনার ইবাদত করেছি এর পরিবর্তে আমি যা চাই তা দিতে হবে।  
. আল্লাহ বললেন তুই কি চাস, উওরে সে বলল... . শয়তানঃ- হে আল্লাহ! আপনি  
আমাকে পৃথিবীতে মারদুদ হিসেবে নিক্ষেপ করছেন। আমার জন্য একটি ঘর  
বানিয়ে দিন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ- তোমার ঘর হাম্মাম খানা! . শয়তানঃ-  
একটি বসার জায়গা দিন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমার বসার জায়গা বাজার ও  
রাস্তা! . শয়তানঃ- আমার খাওয়া প্রয়োজন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমার  
খাওয়া ঐ সব জিনিস যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না! . শয়তানঃ- আমার  
পানীয় প্রয়োজন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ নেশাদ্রব্য তোমার পানীয়! . শয়তানঃ  
আমার দিকে আহ্বান করার কোন মাধ্যম দিন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ নাচ গান  
বাদ্য/বাজনা তোমার দিকে আহ্বান করার মাধ্যম! . . শয়তানঃ- আমাকে লিখার  
কিছু দিন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ শরীরে দাগ দেওয়া (উঙ্কি/ ট্যাটু অংকন করা)!

. শয়তানঃ- আমাকে কিছু কথা দিন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ মিথ্যা বলা তোমার কথা! . শয়তানঃ- মানুষকে বন্দি করার জন্য একটি জাল/ফাঁদ দিন... . আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমার জাল/ ফাঁদ হলো বেপর্দা নারী। . রেফারেন্সঃ গ্রন্থঃ তিবরানী, অধ্যায় : মাজমাউজ্জা ওয়ায়েদ হাদিস নাম্বারঃ ২/১১৯

উপরোক্ত সকল আলোচনা থেকে আমরা, পৃথিবীর সৃষ্টিতে ৬ হাজার বছর আর শয়তানের এবাদত থেকে পেলাম ৬ লক্ষ বছর। মোট ৬ লাখ ৬ হাজার বছর স্পষ্ট করে পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ এছাড়াও জিনদের বসবাস এবং পৃথিবী কিছুদিন খালি পড়ে থাকারও একটা সময়কাল নিশ্চয়ই ছিল।

**এবার আসুন দেখি ইসলাম সরাসরি পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে কি বলে ?**

□ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **بُعَّةُ جُمُعِ الْآخِرَةِ سَدَمِنْ جُمُعَةِ الدُّنْيَا**, তিনি বলেন, ‘দুনিয়া হ’ল আখেরাতের জুম’আ সমূহের মধ্যে একটি জুম’আর সমতুল্য। আর তা হ’ল সাত হাজার বছর।

[তারীখু ত্বাবারী ১/১০, ১৬ ; ইবনু আবী হাতেম হা/১৩৯৮৭, ১৮৪৩৪; শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ৩/৫৪৫; রওয়াতুল মুহাদ্দিহীন হা/২৬৪৪।]

□ যাহহাক বিন যিল্ল আল-জুহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

**يَا بَكَ أَنَا فَإِذَا... حَالُ الصُّبِّ صَلَّى إِذَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ كَانَ هَا دَرَجَةً، ... وَأَمَّا أَعْلَى فِي وَأَنْتَ، دَرَجَاتٍ سَبْعَ فِيهِ مَنَبَرٍ عَلَى اللَّهِ رَسُولَ جَةٍ، فَالدُّنْيَا سَبْعَةُ أَلْفِ الْمَنَبَرِ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ وَأَنَا فِي أَعْلَى دَرَجَةٍ -سَنَةِ وَأَنَا فِي آخِرِهَا أَلْفًا**

‘রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতের পর ছাহাবীদেরকে তাদের রাতে দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম... হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একটি মিস্বারের উপর আছেন যার সাতটি স্তর ছিল। আর আপনি সর্বোচ্চ স্তরে আরোহন

করেছেন... এর ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর অর্থ হ'ল দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বছর আর আমি সপ্তম সহস্রাব্দে পদার্পণ করছি'

[ত্বাবারাগী কাবীর হা/৮১৪৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১৭৭২; বায়হাকী, দালায়েলুল নবুঅত হা/২৯৬০; সুহায়লী, আর-রওয়ুল উনুফ ৪/২৩০।]

□ ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

بِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ تُعَذَّبُ إِمَامَوَ، سَنَةِ أَلْفِ سَبْعَةِ الدُّنْيَا مُدَّةٌ يَقُولُونَ كَانُوا الْيَهُودَ أَنْ  
إِمَّ مَعْدُودَةٍ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ مِ الدُّنْيَا يَوْمًا وَاحِدًا فِي النَّارِ، وَإِمَّا هِيَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ  
-العَذَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: وَقَالُوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ

‘ইহুদীরা বলত, পৃথিবীর মেয়াদকাল সাত হাজার বছর। পৃথিবীর দিনসমূহের তুলনায় প্রতি হাজারে আমাদেরকে একদিন জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবো আর তা নির্দিষ্ট সাতদিন। এরপর শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবো। এর প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন, ‘আর তারা বলে, আমাদের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না’...।

[বাকারাহ ১/৮০; মু'জামুল কাবীর হা/১১১৬০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৮৩৬; রওয়াতুল মুহাদ্দিহীন হা/২১৯৪; সুহায়লী, আর-রওয়ুল উনুফ ৪/২৩০; বর্ণনাটি বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থেও রয়েছে]

□ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন জনৈক নওমুসলিম আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেন,

مِ، {وَإِنَّ يَوْمًا اتَّ وَالْأَرْضُ فِي سِنَةٍ أَيَّ السَّمَوَاتِ خَلَقَ تَعَالَى ا اللهُ إِنَّ،  
تَّةَ أَيَّامٍ، وَجَعَلَ السَّاعَةَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} وَجَعَلَ أَجَلَ الدُّنْيَا سِدِّ  
ا تَعُدُّونَ}، فَقَدْ مَضَتْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّ  
-لَأَيَّامٍ، وَأَنْتُمْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ السَّنَةِ ا

ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি দুনিয়ার বয়স ছয় দিন নির্ধারণ করেছেন এবং ক্রিয়ামত সপ্তম দিনে ধার্য করেছেন। ‘তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান’ (হজ্জ ২২/৪৭)। এর মধ্যে ছয় দিন

অতিবাহিত হয়েছে এবং তোমরা সপ্তম দিনে অবস্থান করছ।

[তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম হা/১৩৯৮৮; তাফসীরে ইবনু কাহীর ৫/৪৪০; তারীখুল খামীস ১/৩৪; দুররুল মানছুর ৬/৬৩।]

□

□ আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **عِنْدَ يَوْمًا وَإِنَّ: عَالِيَّ اللَّهُ قَالَ الْآخِرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ سَبْعَةِ الدُّنْيَا عُمْرُ** (تَعْدُونَ مِمَّا سَنَةِ كَأَلْفِ رَبِّكَ) আখেরাতের দিনগুলোর তুলনায় পৃথিবীর বয়স সাত দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান'।

[ হজ্জ ২২/৪৭)-(তারীখে জুরজান ১/১৪০; ফালাকী, আল-ফাওয়ায়েদ ২/৮৮ ; আল-হাভী ২/১০৫।]

□

পাঠক, এখানে নিশ্চয়ই একটা কনফিউসন সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু এখানে দুনিয়ার বয়স ৭ হাজার বলা হয়েছে। এই ৭ হাজার বছরকে যদি আমরা মানব জাতির বয়স হিসেবে ধরি, তাহলে আর কোন দ্বিধা থাকেনা।

আর তাছাড়া পুরো আলোচনা থেকে এটা বুঝা যায় যে, এখানে (৭ হাজার বছর) সম্ভবত মানব জাতির বয়সকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সমগ্র মানব জাতির বয়স হবে ৭ হাজার বছর বা তার কিছু বেশি। আল্লাহ্ আলম। অন্যথায় উল্লেখিত ৭ হাজারের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির ৬ হাজার বছর, এরপর আরও কিছু সময় এবং জিনদের বসবাসের সময়কালকে পাওয়া যায়না।



সুতরাং পুরো আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম, পৃথিবীর বয়স ৬-৭ লক্ষের ভিতরে এবং পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষকোটি বছরের বিবর্তনবাদী হিসাব একদম মিথ্যা। ওরা যা বলে তা ইসলামের শিক্ষা ও আকিদার বিপরীত। ওরা বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের হিসাব দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে এ বিশ্ব আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে যাতে স্রষ্টার কোনো দরকার নেই, বস্তুত এই বিলিয়ন বছরের হিসাব বিবর্তনেরই অংশ যা বানোয়াট। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লার সৃষ্টি এ পৃথিবী আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, এটির সুনির্দিষ্ট বয়স রয়েছে যার বর্ণনাগুলো আপনাদের নিকট তুলে ধরা হয়েছে।

মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা আমাদের সত্য জানা ও বুঝার তাউফিক দান করুক।

**পবিত্র কাবা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রথম জমিন:**

## Article-1

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সূচনা থেকেই পবিত্র কাবা শরিফকে তাঁর মনোনীত বান্দাদের মিলনমেলা হিসেবে কবুল করেছেন। পবিত্র কাবা পৃথিবীতে রাব্বুল আলামিন মহান আল্লাহর জীবন্ত নিদর্শন।

ভৌগোলিকভাবেই পৃথিবীর মধ্যস্থলে পবিত্র কাবার অবস্থান, যা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে পিএইচডি করেছেন ড. হুসাইন কামাল উদ্দীন আহমদ। তার থিসিসের শিরোনাম হলো—‘ইসকাতুল কুররাতিল আরখিয়া বিন্ নিসবতে লি মাক্কাতিল মুকাররামা।’ (মাজাল্লাতুল বুহসুল ইসলামিয়া, রিয়াদ : ২/২৯২)



ওই থিসিসে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক দলিল-দস্তাবেজের আলোকে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে পবিত্র কাবাই পৃথিবীর মেরুদণ্ড ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইসলামের রাজধানী হিসেবে পবিত্র কাবা শরিফ একটি সুপরিচিত নাম। পানিসর্বস্ব পৃথিবীতে মাটির সৃষ্টি এ পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করেই।

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক ড. খালিদ বাবতিনের গবেষণায় দেখা গেছে, সৌদি আরবে

অবস্থিত পবিত্র কাবাই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। (আল  
আরাবিয়া : ২৩ জুলাই, ২০১২)

আরেকটি বিষয় হলো, বছরের বিশেষ একটি দিন দুপুরে  
সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকে। তখন পবিত্র কাবা বা মক্কায়  
অবস্থিত কোনো অটালিকায় ছায়া দৃষ্টিগোচর হয় না।  
যেমন-২০১৪ সালের ২৮ মে দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটে সূর্য  
ছিল পবিত্র কাবার ঠিক মাথার ওপর। পৃথিবীর আর  
কোথাও এমনটি হয় না।



পবিত্র কাবাগৃহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা পৃথিবীর  
সর্বপ্রথম ও সুপ্রাচীন ঘর। পবিত্র কোরআনের ভাষায়,  
‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্ধারিত  
হয়েছে, সেটিই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কা নগরীতে)  
অবস্থিত।’ (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯৬)

মাটিতে রূপান্তর হওয়ার আগে পবিত্র কাবা সাদা ফেনা আকারে ছিল। সে সময় পৃথিবীতে পানি ছাড়া কিছু ছিল না। মহান আল্লাহর আরাশ ছিল পানির ওপর। হাদিসের ভাষ্য মতে, পবিত্র কাবার নিচের অংশটুকু পৃথিবীর প্রথম জমিন। বিশাল সাগরের মাঝে এর সৃষ্টি। ধীরে ধীরে এর চারপাশ ভরাট হতে থাকে। সৃষ্টি হয় একটি বিশাল মহাদেশের। এক মহাদেশ থেকেই সৃষ্টি হয় অন্য সব মহাদেশ।

মাটি বিছানোর পর জমিন নড়তে থাকে। হেলতে থাকে। এর জন্য মহান আল্লাহ তাআলা পাহাড় সৃষ্টি করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় (হেলে না যায়)’ (সূরা : নাহল, আয়াত : ১৫)

## Article-2

**যে কারণে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত পবিত্র কাবা শরীফ**

ইসলাম ডেস্ক : মুসলমানদের কিবলা পবিত্র কাবাঘর। হাজার মৌসুমে প্রতিবছর লাখ লাখ মুসলমান কাবাঘর তাওয়াফ করতে মক্কায় গমন করেন। পবিত্র কোরাআন ও হাদিসের ব্যখ্যায় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মক্কা নগরের অবস্থান হওয়ায় ‘বায়তুল্লাহ’ বা ‘

কাবাঘর' মক্কাতেই স্থাপন করা হয়। আল্লাহতায়ালার নির্দেশে ফেরেশতারা প্রথম দুনিয়ায় কাবাগৃহ নির্মাণ করে এখানে ইবাদত করেন। কাবাঘরটি আল্লাহর আরশে মুয়াল্লার ছায়াতলে সোজাসুজি সপ্তম আসমানে অবস্থিত মসজিদ বাইতুল মামুরের আকৃতি অনুসারে ভিত্তিস্থাপন করা হয়। আল্লাহতায়ালার কাবাগৃহকে মানবজাতির ইবাদতের কেন্দ্রস্থলরূপে নির্দিষ্ট করেন।

মুসলিম মানবজাতির ইবাদতের কেন্দ্রস্থল কাবা শরীফ পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রতেই অবস্থিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে অনেকেই এই বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতে চান।

### **পবিত্র কাবা শরীফের অবস্থান ও সৃষ্টিকাল নিয়ে ইসলামের ব্যখ্যা:**

বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর আদি মানব-

মানবী হজরত আদম (আ.) ও হজরত হাওয়া (আ.) ইবাদতের জন্য একটি মসজিদ প্রার্থনা করেন। আল্লাহতায়ালার তাদের দোয়া কবুল করে কাবাগৃহকে ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করে দেন। এরপর হজরত নূহ (আ.)-

এর যুগের মহাপ্লাবনে কাবা শরীফ ধসে যায়। পরে আল্লাহর হুকুমে হজরত ইবরাহিম (আ.) তার পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-

কে সঙ্গে নিয়ে কাবাগৃহের পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। আল্লাহতায়ালার নির্দেশে আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরীফের নির্মাণ হজরত ইবরাহিম (আ.)-

এর জীবনের অমর কীর্তি ও অন্যতম অবদান।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি পবিত্র কাবাঘর পুনঃনির্মাণের সৌভাগ্য অর্জন করলেও একমাত্র হজরত ইবরাহিম (আ.)-

এর নির্মাণের কথা আল্লাহতায়াল্লা পবিত্র কোরআনে কারিমের অংশ বানিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য সংরক্ষিত করেছেন।

কোরআনে কারিমে ওই ঘটনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।  
ইরশাদ হয়েছে,

‘স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তারা দোয়া করেছিল, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমলটুকু কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। ওহে পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধর থেকে একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি কর। আমাদের হজের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। হে আমাদের প্রভু! এ ঘরের পড়শিদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠাও, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতগুলো পাঠ করবেন। তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ -সূরা বাকারা : ১২৭-১২৯

কাবাগৃহের নির্মাণ কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। কাবা নির্মাণের সময় হজরত ইবরাহিম (আ.) যে দোয়া করেছিলেন সেগুলো যত্নের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার মানুষের স্বভাব হলো, সমাজে বা ধর্মীয় কাজে সামান্য অবদান রেখে মানুষের সামনে তা বারবার উল্লেখ করে এবং আত্মপ্রশংসায় ডুবে যায়। অথচ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ঘর নির্মাণ করছেন, তবুও তার মনে এক বিন্দু অহঙ্কার নেই। ছিল বিনয়পূ



র্গ মিনতি বিনয়ানত কণ্ঠে বারবার তিনি বলেছেন,  
 ‘হে আল্লাহ! মেহেরবানি করে আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করে নাও’ দোয়ার দ্  
 বিতীয় বাক্যে বলেছেন,  
 ‘হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো’

### Article-3

#### কাবা কি পৃথিবীর ভৌগোলিক কেন্দ্র?

পৃথিবীর হৃদয়, মুসলিম মিলন কেন্দ্র কাবাঘর। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি কেন্দ্র 'Golden ratio', পৃথিবীর এই গোল্ডেন রেশিও কাবাসরীফ, মক্কা,সৌদিআরব।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে কাবা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। পৃথিবীর  
 মধ্যস্থলে কাবার অবস্থান।

বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা জানি যে, বছরের একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ সময়ে  
 (মধ্যাহ্নে) সূর্য কাবা শরিফের ঠিক মাথার ওপরে অবস্থান করে। তখন কাবা শরিফ  
 বা মক্কা শরিফে অবস্থিত কোনো অট্টালিকা বা কোনো স্থাপনারই ছায়া চোখে পড়ে  
 না। পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে এরূপ ঘটে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, পবিত্র কাবা  
 ভূমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

ভূপৃষ্ঠের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় কাবাকে পৃথিবীর কেন্দ্র বা হৃদয় বলা যায়। মানুষের হৃ

ৎপিণ্ডকে যেমন হৃদয় বলা হয়, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুকেও তেমনি সঙ্গতভাবেই পৃথিবী  
র হৃদয় বলে ভিহিত করা চলো। এটা হলো একধরনের বৈজ্ঞানিক বা বস্তুগত ধারণা,  
যে জন্য কাবাকে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড হিসেবে অভিহিত করা যায়।

মহান স্রষ্টা এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বমতার অধিকারী  
। তিনি

স্রষ্টা আর বাকি সবই তাঁর সৃষ্টি। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির পর তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ, রণাবেণ ও  
প্রতিপালন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপৌ নন। মহাবিশ্বের চন্দ্র-সূর্য-  
গ্রহ-তারা-নদ ইত্যাদি

সবই তাঁর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিজগতের সব  
কিছুই

একমাত্র তাঁর হুকুম-নির্দেশই মেনে চলছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এটাকে  
কথিত মাধ্যাকর্ষণ আর

ইসলামের পরিভাষায় এটাই একত্ববাদ, অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির নিঃসঙ্কোচ

আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য।

**আদি মানব আদম আ: ও হাওয়া আ:-**

কে সৃষ্টির পরমহান আল্লাহ জান্নাতে বসবাসের অনুমতি দেন। জান্নাতের সব নিয়ামত  
প্রদান করে শুধু একটিমাত্র বুরে নিকটবর্তী হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়। কিন্তু  
শয়তানের প্ররোচনায় কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আদম-

হাওয়া আ: উভয়েই আল্লাহর হুকুম বিস্মৃত হয়ে ওই নিষিদ্ধ বৃরে নিকটবর্তী হয়ে সে বৃরে ফল আশ্বাদন করেন। আল্লাহর নিষেধ অমান্য করায় আল্লাহ তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন।

এর দ্বারা মানুষের কৃতকর্মের ফল মানুষকে যে ভোগ করতে হয়, সে শিক্ষাই মহান

সৃষ্টিকর্তা

মানবজাতিকে প্রদান করেছেন। এ পবিত্র স্থানে আদি মানব ও প্রথম নবী আদম আ: বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং এ স্থানই আখেরি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও সর্বোত্তম

মানুষ মুহাম্মদ সা:-

এর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরীতে বায়তুল্লাহ শরিফ বা পবিত্র কাবা অবস্থিত।

‘বায়তুল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর ঘর। কাবা শরিফ দুনিয়ার প্রাচীনতম ও পবিত্রতম

ইবাদতগাহ। আদি মানব আদম আ: দুনিয়ায় আসার পর আল্লাহর ইচ্ছায় ফেরেশতা জিব্রাইল আ: কর্তৃক দেখিয়ে দেয়া নির্দিষ্ট স্থানে ইবাদতগৃহ নির্মাণ করেন। দুনিয়ায়

এটাই

প্রথম মসজিদ, যা ‘বায়তুল্লাহ’ বা কাবা শরিফ। আদম আ: ও তার বংশধরগণ এ

ঘরেই সালাত বা নামাজ আদায় করতেন। পরে নুহ আ:-

এর সময় যে মহাপ্লাবন হয়, তাতে কাবাগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে আল্লাহর

হুকুমে মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম আ: তার পুত্র ইসমাইল আ:-

কে সাথে করে ওই একই স্থানে কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। কাবাগৃহের অদূরে

অবস্থিত 'জাবালুল কাবা' পর্বত থেকে পাথর সংগ্রহ করে সেগুলো একটির পর

একটি স্থাপন করে পৃথিবীর ওই প্রথম ইবাদতগাহ পুনর্নির্মিত হয়।

ওই সময় থেকেই হজের রেওয়াজ চালু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

মুসলমানগণ প্রতি

বছর জিলহজ মাসে কাবা শরিফে সমবেত হয়ে হজ পালন করেন।

সারা দুনিয়ার মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সময় কাবাকে কেবলা, অর্থাৎ

কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে। হজ ও ওমরা পালনের সময় হাজীগণ

সাতবার কাবা শরিফ তাওয়াফ করেন। কাবার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এটা

গোলাকারভাবে নির্মিত। গোলাকারভাবে নির্মিত হওয়ার কারণ হলো, এটি পৃথিবীর

কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং এটা মুসলিম

মিল্লাতের কেবলা। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ

আদায়

ও সেজদা করতে হয়। কাবা শরিফে নামাজ আদায়কারীগণও কাবার চারপাশ ঘিরে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ান। কাবাকে বায়তুল্লাহ শরিফ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়।

মহান স্রষ্টার আরশের নিচেই এর অবস্থান। এ পবিত্র স্থানকে স্বয়ং আল্লাহ শান্তি ও

নিরাপত্তার স্থান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

অতএব, এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীমা। মুসলিম- হৃদয়ে কাবার অবস্থান হৃৎপিণ্ডের মতো, তার অনুভবও হৃদস্পন্দনের মতোই গভীর ও অতলস্পর্শী। এ সম্পর্কে

মহান আল্লাহর

ঘোষণা : ওরা কি দেখে না আমি হারমকে (কাবার চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্ধারিত এলাকাকে হারম বলা হয়) নিরাপদ স্থান করেছি।’ (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৭আংশিক)।

কাবার মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

‘মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ

প্রতিষ্ঠিত হয় তা তো বাক্কায় (মক্কার অপর নাম বাক্কা) এটা বরকতময় ও

বিশ্বজগতের দিশারী।

এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে,

(যেমন) মাকামে ইব্রাহিম, এবং যে কেউ সেখানে

প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে,

আল্লাহর

উদ্দেশ্যে ওই গৃহে গিয়ে হজ করা তার ওপর ফরজ এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে

(সে জেনে রাখুক) আল্লাহ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী ননা’

(সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৯৬-৯৭)।

আল কুরআনে অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন :

‘সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।’

(সূরা বাকারা, ১৫৮ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশ)। শুধু ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে পবিত্র

মক্কা নগরী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তাই নয়; ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যের

দিক থেকেও মক্কা নগরী মানবসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। আদম আ:

থেকে আখেরি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা: পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী-

রাসূলের আগমন ঘটেছে, তারা সবাই কোনো না কোনো সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে

এসে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছেন।

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে,

‘কাবা শরিফে নামাজ পড়ার সাওয়াব সাধারণ মসজিদে পড়ার তুলনায় এক লাখ গুণ

বেশি।’ কাবা শরিফে মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করে সিজদা করার সময়

মনে হয়, এটাই সে স্থান যা পৃথিবীর হৃদয় বা কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত, মহান



ঐশ্বর্য আরশের নিচে অবস্থিত এ স্থানে আদি মানবের প্রথম বসতি গড়ে উঠেছিল,  
মহান ঐশ্বর্য নির্দেশে তাঁর আরশের ছায়ার নিচে মানবজাতির প্রথম ইবাদতগাহ  
(বায়তুল্লাহ শরিফ) নির্মিত হয়, এটাকেই কেবলা করে সমগ্র মুসলিম জাতি মহান  
ঐশ্বর্য উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়।

পৃথিবির গোল্ডেন রেশিও কেন্দ্র কাবা?

এই বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিটি বস্তুর নিখুঁত অবকাঠামোগত মান হচ্ছে ১.৬১৮

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যেই গোল্ডেন রেশিও (Golden Ratio) বা স্বর্গীয় অনুপাতটি আছে।

মানুষের মুখের দৈর্ঘ্যের সাথে নাকের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১.৬১৮(প্রায়)।

মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুইয়ের দৈর্ঘ্য এবং কঙ্গি থেকে কনুইয়ের  
দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১.৬১৮(প্রায়)।

মানুষের নাভি থেকে পায়ের পাতার আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত এবং নাভি থেকে মাথা  
পর্যন্ত অনুপাত ১.৬১৮(প্রায়)।

এভাবে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই "গোল্ডেন রেশিও বা স্বর্গীয়" অনুপাতে গঠিত।

শুধু তাই নয়, শামুখের খোলস, ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন, মুরগীর ডিম, বৃক্ষের কাণ্ড বিন্যাস, মানুষের হৃদপিণ্ড, DNA, ফুল, মাছ, গাছপালা, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুতেই স্রষ্টা শুধুমাত্র ১.৬১৮ মান ব্যবহার করেছেন। আর সেই অনুপাতই হল "স্বর্গীয় অনুপাত"।

পবিত্র নগরী মক্কার নাম সমগ্র কুরআনে মাত্র একবার উল্লেখিত হয়েছে সুরা

আল-ইমরান এর ছিয়ানব্বই আয়াতে।

এই আয়াতে মক্কা শব্দটি উচ্চারিত হওয়া পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ২৯ টি এবং সমগ্র আয়াতে রয়েছে ৪৭ টি বর্ণ।

এখন আমরা যদি উক্ত আয়াতটি লিখে ফাইমেট্রিক্স (ফাইমেট্রিক্স হচ্ছে এক ধরনের সফটওয়্যার যার দ্বারা কোন ছবির গোল্ডেন রেশিও পয়েন্ট মাপা হয়) আর এটাই

হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্ট  $\Phi$  এর মান।

এছাড়া, আমরা জানি আল্লাহর ঘর কাবা হজ্জের স্থান মক্কা থেকে উত্তর মেরু ৭৬৩১ ৬৮ কিমি

এবং মক্কা থেকে দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব ১২৩৪৮৩২ কিমি। ভাগফল দাড়ায় " ইউনিক গোল্ডেন নাম্বার ১.৬১৮" (প্রায়)

সুতরাং গোল্ডেন রেশিও অনুপাত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে সহজে আসতে পারি যে, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একজন এবং তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ।

## Article-4

### পৃথিবীর প্রথম মাটির ওপর কাবাঘর

সাগর চৌধুরী, সৌদি আরব থেকে

২২ জুলাই ২০১৯, ১২: ১৩ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

মুসলমানরা মনে করেন, পৃথিবীতে মহান রাব্বুল আলামীনের অনন্য নিদর্শন

পবিত্র কাবা শরিফ।

ভৌগোলিকভাবে গোলাকার পৃথিবীর মধ্যস্থলে বরকতময় পবিত্র কাবার অবস্থান-

এটাও অনেকের জন্য আশ্চর্যজনক বিষয়। কাবাগৃহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সুপ্রাচীন ঘর। কোরআনের ভাষায়, ‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর,

যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটিই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কা নগরীতে অবস্থিত’ (সূরা: আল ইমরান, আয়াত: ৯৬)

ইসলামী জ্ঞানের তথ্যমতে পৃথিবীতে ভূমির সৃষ্টি হয় বিশাল সাগরের মাঝে  
 , এর

মাঝে মঝায় অবস্থিত কাবাঘরের স্থলকে কেন্দ্র করেই। তাই, কাবার নিচে  
 র অংশটুকু অর্থাৎ কাবাঘরের জমিনটুকু হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মাটি।

ধীরে ধীরে এর চারপাশ ভরাট হয়ে সৃষ্টি হয় একটি বিশাল মহাদেশের।  
 পরে এক

মহাদেশ থেকেই সৃষ্টি হয় সাত মহাদেশের। মাটিতে রূপান্তর হওয়ার আগ  
 ে কাবা

সাদা ফেনা আকারে ছিল। সে সময় পৃথিবীতে পানি ছাড়া কিছু ছিল না।  
 আল্লাহর

আরশ ছিল পানির ওপর। মাটি বিছানোর পর জমিন নড়তে থাকে। হেলত  
 ে থাকে।

এর জন্য মহান আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি পৃথি  
 বীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দো  
 লিত না হয় ( হেলে না যায়)।’ ( সুরা : নাহল, আয়াত : ১৫)।

এভাবেই পবিত্র কাবার বরকতে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এখানে  
 মানবসভ্যতার গোড়াপত্তন হয়।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ পবিত্র কাবা শরিফকে তার মনোনীত বান্দাদের

মিলনমেলাস্থল হিসেবে কবুল করেছেন । দুনিয়াজুড়ে মুসলমানদের কিবলা এ কাবা শরিফ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও শত্রুদের আক্রমণের কারণে বেশ কয়েক বার

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পবিত্র কাবা শরিফ। তাই বেশ কয়েকবারই ক্ষতিগ্রস্ত কাবাকে

পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য মতে, কাবাকে এ

পর্যন্ত ১২ বার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে সংরক্ষণ করতে কাবা শরিফকে সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে আধুনিক ও শক্তিশালী প্রযুক্তির প্রয়োগে

সংস্কার করা হয়। কাবা পুনঃসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯৬ সালে হাতিমে কাবাও

পুনঃনির্মাণ করা হয়।

পবিত্র কাবা শরিফ নির্মাণ-

পুনঃনির্মাণে বিভিন্ন যুগে হজরত আদম ( আ. ) , হজরত ইব্রাহিম ( আ . ) , হজরত

ইসমাইল ( আ. ) এবং আখেরি নবী হজরত মুহাম্মাদ ( সা. ) ও অংশ গ্রহণ

করেছিলেন। নবী ইব্রাহিমের ( আ. ) আমল থেকেই মূলত পবিত্র কাবা শরিফ

আয়তক্ষেত্র আকৃতির ছিল।

ইসলামের আগমনের পূর্বে কুরাইশরা যখন পবিত্র কাবাকে পুনঃনির্মাণ করে তখন

তহবিলের অভাবে পবিত্র কাবা শরিফের পুরো কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি তারা। যে স্থানটি তখন নির্মাণ করতে পারেনি সেই স্থানটিকে বলা হয় ‘হাতিমে কাবা’। এটি

কাবারই অংশ। এ কারণে হাতিমে কাবাকে তাওয়াফে অন্তর্ভুক্ত করতে হ য়া যা

একটি ছোট গোলাকার প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত।



পবিত্র কাবা শরিফের এক কোণে সংযুক্ত ‘হাজরে আসওয়াদ’ কালো পাথরটি আগে আকারে বড় ছিল। বর্তমানে এ পাথরটি ভেঙে ৮ টুকরায় বিভিন্ন সাইজে বিভক্ত। যা একটি সিলভার রংয়ের ফ্রেমে একত্র করে কাবা শরিফের পূর্ব-

দক্ষিণ কোণে লাগানো। পাথরটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যাসহ অনেকবার চুরি ও জালিয়াতির চেষ্টার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হাজরে

আসওয়াদের প্রথম সিলভার ফ্রেমটি তৈরি করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন জুবা ইরা

প্রাক ইসলামি যুগ থেকে এখন পর্যন্ত কাবা শরিফের চাবি একটি পরিবারের কাছেই রয়েছে। সম্মানিত এ পরিবারটি হলো বনু তালহা গোত্র। এ গোত্র ১৫ শতাব্দী ধরে এ দায়িত্ব পালন করছে। এটি ওই পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত

হন।

**বছরে দু বার এর পরিষ্কার-**

পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়। প্রথমবার করা হয় শাবান মাসে আর দ্বিতীয় বার করা

হয় জিলকদ মাসো। এ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বনু তালহা তথা আলশিবি

পরিবারের লোকেরাই করে থাকেন।

পবিত্র জমজমের পানি, তায়েফ গোলাপ জল এবং বহু মূল্যবান ‘উড’ তৈল দিয়ে একটি পরিস্কার মিশ্রণ তৈরি করে তা দিয়েই পবিত্র কাবা শরিফ পরিষ্কার করা হয়।

পবিত্র নগরী মক্কার গভর্নর এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে

আমন্ত্রণ জানান।

একটা সময়ে পবিত্র কাবা শরিফের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্তের মানুষ এ পবিত্র ঘরে প্রবেশ করে ইবাদাত-

বন্দেগিও করতো। হজের সময় হাজিরা

ইচ্ছা করলে এতে প্রবেশ করতে পারতো।

কিন্তু হাজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ঘরের নিরাপত্তার জন্যই এখন কেউ ইচ্ছা

করলেও অভ্যন্তরে যেতে পারে না। এটা এখন মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ মেহমানদের জন্য খোলা হয়।

পবিত্র কাবা শরিফ সম্পর্কে অবিশ্বাস্য হলেও চিরন্তন সত্য যে, এর চার দিকে ঘোরা অর্থাৎ তাওয়াফ কখনো বন্ধ হয় না। তবে হ্যাঁ, নামাজের সময় যখন মুয়াজ্জিন

জামাতের জন্য ইক্বামাত দেন ঠিক নামাজের সময় তাওয়াফকালীন অবস্থায় যে

যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়েই নামাজে অংশগ্রহণ করে। নামাজের সালাম

ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার তাওয়াফ শুরু হয়ে যায়।

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক ড. খালিদ বাবতিনের

গবেষণায় দেখা গেছে, সৌদি আরবে অবস্থিত পবিত্র কাবাই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

(আল আরাবিয়া : ২৩ জুলাই, ২০১২)

আরেকটি বিষয় হলো, বছরের বিশেষ একটি দিন দুপুরে সূর্য ঠিক মাথার ওপর

থাকো তখন পবিত্র কাবা বা মক্কায় অবস্থিত কোনো অট্টালিকায় ছায়া দৃষ্টিগোচর

হয় না। যেমন - ২০১৪ সালের ২৮ মে দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটে সূর্য ছিল পবিত্র

কাবার ঠিক মাথার ওপর। পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি হয় না।

বর্তমানে কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সৌদি রাজপরিবারের। সৌদী সরকারের প্রধান (বাদশাহ) কাবা শরীফের মোতাওয়াল্লির দায়িত্বে থাকেন।

Source: News paper & Islamic Blog

### **৭ম আসমানের বায়তুল মামুর থেকে কিছু পড়লে কাবার উপরে পড়বে:**

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন জান্নাতে থাকতেন তখন উনি ফেরেশতাদের তাওয়াফ করার স্থান বায়তুল মামুর কে লক্ষ্য করেছিলেন। দুনিয়াতে আসার পর হযরত আদমের ইচ্ছা হয় এই পৃথিবীর মাটিতেও এরকম একটা বায়তুল মামুর থাকবে যেখানে উনার সন্তানরা নিয়মিত তাওয়াফ করবে।

মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বায়তুল মামুর কে

দেখেছিলেন। -“ এরপর আমাকে বায়তুল মামুরে উঠান হল। বললামঃ হে জিবরাঈল! এ কি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে ‘বায়তুল মামুর’। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের জন্য প্রবেশ করে। তারা একবার তাওয়াফ সেরে বের হলে কখনও আর ফের তাওয়াফের সুযোগ হয় না তাদের। ” গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ১/ কিতাবুল ঈমান হাদিস নাস্বার: 313 ] আর কাবা ঘর হল বায়তুল মামুরের ঠিক সোজাসুজি নিচো কিন্তু দুনিয়ার জীবনে যেহেতু আমরা আল্লাহর আরশকে সামনে পাবো না ও আল্লাহর আরশের সামনে সিজদা দিতে পারবো না তাই আমরা মুসলমানরা এই কাবা ঘরের চতুর্পাশে একসাথে তাওয়াফ করি। কারন কাবাঘর হচ্ছে দুনিয়ায় বায়তুল মামুরের প্রতিনিধি। ফেরেশতাদের মূল ইবাদতের ক্ষেত্র যেমন বায়তুল মামুর ঠিক তেমনি আমাদের জন্য কাবাঘর। ফেরেশতার। যেমন আল্লাহ আরশ ও বায়তুল মামুরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করে ঠিক তেমনি আমরাও কাবাঘর কে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করি। কাবা ঘর হচ্ছে আল্লাহর আরশের একদম নিচো। কাবা ঘর হচ্ছে আল্লাহর ঘর। কাবা ঘর হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহর আরশের প্রতিনিধি। আল্লাহর আরশ কে কেন্দ্র করে যেমন এই মহাবিশ্বের সব গ্রহ নক্ষত্র ঘুরছে ঠিক তেমনি আমরা মুসলমানরা এক সাথে এই কাবা ঘরের চতুর্পাশে ঘুরি। আর এটাকেই তাওয়াফ বলে। আর এই তাওয়াফ করার আমলটা আল্লাহ সুবহানাতায়ালা হযরত ইব্রাহিম কে শিখিয়ে দিয়েছেন।

### কাবা ঘরের ইতিহাস

لَعَالَمِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى ۚ

(আল ইমরান - ৯৬)

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।

### \* ফেরেশতাদের কাবা ‘বায়তুল মামুর’এর পরিচয়ঃ

মিরাজের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম আসমানে বায়তুল মামুরে ঠেস দিয়ে বসাবস্থায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে দেখেছিলেন।

হযরত কাতাদাহ, রবী ইবনে আনাস ও সুদী (রহ:) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেছেন,

”তোমরা কি জান, বায়তুল মামুর কী? তাঁরা বললেন, মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(বায়তুল মামুর) হল- ৭ম আসমানে একটি মসজিদ আছে কা’বা ঘরের সোজাসুজি (উপরে)

তা যদি পড়ে যায়, তাহলে তা কাবারই উপরে পড়বে।

তাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ পড়ে ও তাওয়াফ করে ।

তাঁরা যখন সেখান থেকে একবার বেরিয়ে যায়, তখন তারা আর সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ”বায়তুল মামুর কী? তিনি বলেন, ৭ম আকাশের উপর আরশের নিচে একটি ঘর, যাকে যুরাহ বলা হয়। এরই অপর নাম হল বায়তুল মামুর।”

(তাফসীরে কুরতুবী)



**N:B:** বায়তুল মামুর থেকে কিছু পড়লে কাবার উপরে পড়বে। এটা তখনি সম্ভব, যখন পৃথিবী স্থির থাকবে। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে এটা সম্ভব নয়।

### **সাত জমিন, আসমান ও সমুদ্র নিয়ে অপবিজ্ঞানের মিথ্যাচার:**

ইসলাম যেটাকে সাত জমিন (দুনিয়া) বলেছে, অপবিজ্ঞানীরা সেটাকে সাত মহাদেশ (ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি) বলে মিথ্যাচার করছে।

অথচ সেটা হচ্ছে, স্তরে স্তরে সাজানো সাতটি জমিন (এই পৃথিবীর নিচে বা পাশের দিকে)।

ইসলাম যেটাকে সাত আসমান (সুরক্ষিত ছাদ) বলেছে, অপবিজ্ঞানীরা সেটাকে বায়ুমণ্ডলের সাত স্তর (ট্রোপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল ইত্যাদি) বলে মিথ্যাচার করছে।

অথচ সেটা হচ্ছে, স্তরে স্তরে সাজানো সাতটি আসমান (এই পৃথিবীর উপরের দিকে)।

ইসলাম যেটাকে সাত সমুদ্র (পৃথিবীর নিচের বা আসমানের উপরের) বলেছে, অপবিজ্ঞানীরা সেটাকে সাত মহাসাগর (আটলান্টিক, প্রশান্ত ইত্যাদি) বলে মিথ্যাচার করছে।

অথচ সেটা হচ্ছে, স্তরে স্তরে সাজানো সাতটি সমুদ্র (এই পৃথিবীর নিচে বা পাশের দিকে)।

ইসলামে যেভাবে বলা হয়েছে, বাস্তবতা সেটাই। অর্থাৎ ৭ জমিন নিচের দিকে স্তরে স্তরে সাজানো। ৭ আসমান উপরের দিকে স্তরে স্তরে সাজানো। ৭ সমুদ্র উপরে বা নিচের দিকে স্তরে স্তরে সাজানো।

আরো বুঝতে নিচের আয়াত ও হাদিস টি দেখুন এবং গভীর ভাবে চিন্তা করুন।

**আল্লাহ বলেন:**

لُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا ۚ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَيُّ عِلْمًا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।

[ সূরা তালাক ৬৫:১২ ]

**আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ**

তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ এক সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাদের উপর মেঘরাশি প্রকাশিত হল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের প্রশ্ন করেন : তোমরা জান এটা কি? তারা বললেনঃ আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি



বললেনঃ এটা হল যমিনের পানিবাহী উটা। আল্লাহ তা'আলা একে এমন জাতির দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা তাঁর কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না এবং তাঁর কাছে মুনাজাতও করে না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তোমাদের উপরে কি আছে তা জান? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এটা হল সুউচ্চ আকাশ , সুরক্ষিত ছাদ এবং আটকানো তরঙ্গ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তোমাদের এবং এর মাঝে কতটুকু ব্যবধান তা তোমাদের জানা আছে কি? তারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের ও এর মাঝে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এর উপরে কি আছে তা তোমরা জান কি? তাঁরা বললেন , আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এর উপরে দুইটি আকাশ আছে যার মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব, এমনকি তিনি সাতটি আকাশ গণনা করেন এবং বললেনঃ প্রতি দু'টি আকাশের মাঝে পার্থক্য আকাশ ও যমিনের ব্যবধানের সমপরিমাণ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান? তাঁরা বললেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এগুলোর উপরে আছে ( আল্লাহর ) আরশ। আরশ ও আকাশের মাঝের পার্থক্য দুই আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তিনি আবার বললেনঃ তোমরা কি জান তোমাদের নিচে কি আছে? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ উহা হল যমিন , তারপর আবার বললেন, তোমরা কি জান এর নিচে কি আছে? তাঁরা বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এর নিচে আরো এক ধাপ যমিন আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব। তারপর সাত স্তর যমিন গুণে বললেনঃ প্রতি দুই স্তরের মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব বর্তমান। তিনি আবার বললেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তোমরা যদি একটি রশি নিম্নতম যমিনের দিকে ছেড়ে দাও তাহলে তা আল্লাহ

তা’আলা পর্যন্ত গিয়ে পৌছবো তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “  
তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনিই সববিষয়ে  
সর্বশেষ পরিজ্ঞাত “ ( সূরাঃ আল-হাদীদ-৩)।

যইফ , যিলালুল জুনাহ্, (৫৭৮)

আবু দীসা বলেন : উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীবা আইউব, ইউনুস ইবনু উবাইদ  
ও আলী ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, আল-হাসান আল-বাসরী  
(রহঃ) আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে সরাসরি কিছু শুনেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম উক্ত  
হাদীসের ( আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে ) ব্যাখ্যায় বলেন : উক্ত রশি আল্লাহ তা’আলার  
জ্ঞান, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বত্র বিস্তৃত। তিনি তাঁর আরশে  
উপবিষ্ট , যেমন তিনি তাঁর পাক কালামে বলেছেন।

তিরমিজি- ৩২৯৮]

<http://ihadis.com/books/tirmidi/chapter/44>

### **সূর্যের গতিপথ এবং আমেরিকার সাথে দিন রাত্রির পার্থক্য:**

প্রথমে অনেকগুলো আয়াত ও হাদিস দেয়া হলো। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।  
বিশেষ করে সূরা কাহাফের ১৭ নং আয়াত টা কয়েকবার পড়লে আপনি নিজেই সূর্যের

গতিপথ বুঝে ফেলবেন, ইনশাআল্লাহ আর যারা বুঝবেন না, তাদের জন্য নিচে কিছু আলোচনা থাকবে।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ  
ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْيَهُودَ الْمُهْتَدُونَ وَمَنْ  
يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। [ সূরা কা'হফ ১৮:১৭ ]

### সূর্য কি পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে?

মান্যবর শায়খ ((Allama uthaymeen(rh))) উত্তরে বলেন যে, শরীয়তের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এই ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমন ঘটে। সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) [البقرة: ২৫৮]

“আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।” [সূরা আল-বাকার, আয়াত: ২৫৮] সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

আল্লাহ বলেন,

(فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً □ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْقِمُ إِنِّي  
بَرِيءٌ □ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ ۷۸) [الانعام: ۷۸]

“অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার রব, এটি বৃহত্তরা অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্তা” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৭৮]

এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয় নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেলা। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

আল্লাহ বলেন,

(وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ  
ذَاتَ الشَّمَالِ) [الكهف: ১৭]

“তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১৭] পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে পৃথিবী নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ ۖ لَهَا ذَلِكِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ٣٨ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ ۖ فِي فَلَكٍ ۖ يَسْبَحُونَ ٤٠) [يس: ٣٨, ٤٠]

“সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খজুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।”  
[সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৩৮-৪০]

সূর্যের চলা এবং এ চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এ চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মঞ্জিল নির্ধারণ করার অর্থ এ যে, সে তার মঞ্জিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মঞ্জিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যরকে বলেছেন,

«أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

“হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ‘আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে”[1]

এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে। আল্লাহ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এ ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এ কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়। হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এ মুহূর্তে মনে আসছেনা। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এ বিষয়টির দ্বারা উন্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!

শাইখের আলোচনা শেষ হলো

Link: পৃথিবী স্থির এবং সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণয়মান  
ফতওয়া আরকানুল ইসলাম by Allama uthaymeen(rh):

[https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post\\_5.html](https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html)

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=334931086964090&id=282165055574027](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334931086964090&id=282165055574027)

+++++

এবার আল অদিয়াতের ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টি তত্ত্বের ৮ম খন্ড থেকে পড়ুন।  
আপনারা জানেন যে এই আটকেল গুলো অনেক বড় বড়। তাই আমি শুধু  
আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে যতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ ততটুকুই নিয়েছি।

আল্লাহ বলেন:

لَكَ يَسْبَحُونَ فِي كُلِّ مَسِّ وَالْقَمَرُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ  
তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন  
কক্ষপথে বিচরণ করে।

[আশ্বিয়াঃ৩৩]

আধুনিক কাব্বালিস্টিক সুডো সায়েন্স আমাদেরকে বলে। চাঁদ সূর্যের তুলনায় অতিশয়  
ক্ষুদ্র। পৃথিবীর চেয়েই সূর্য ১৩ লক্ষগুন বড়! অথচ সত্য হচ্ছে আল্লাহ আযযা ওয়াযাল  
চাঁদ ও সূর্যকে সমান্তরাল কক্ষপথে রেখেছেন। চাঁদ সূর্য নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে  
একটির পিছনে আরেকটি আসমানি সমুদ্রের কক্ষপথে(ফালাকে) সন্তরনশীল। চাঁদ  
সূর্যকে স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ  
নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণরত। এখানে 'প্রত্যেকে' দ্বারা আমি শুধু চাঁদ সূর্যের কথাই  
বলেছি। কিন্তু যারা আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে মিথ্যাচার করে তারা কুরআনের আয়াতে  
যখন 'প্রত্যেকে' শব্দটিকে পায় তারা এর দ্বারা বলতে চায়, এই 'প্রত্যেকের' মধ্যে যার  
উল্লেখ নেই, সেটাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী সবকিছুই!!! এদের যুক্তি হচ্ছে,  
যদি প্রাচীনকালে সুস্পষ্টভাবে পৃথিবীর গতির কথা বলা হত, তবে মুসলিমরা মুরতাদ  
হয়ে যেত! নাউজুবিল্লাহ!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ আয়াতে চাঁদ, সূর্য, দিন-রাত্রির বাইরে অন্য কিছুকে উল্লেখ করেননি। এখানে 'কুল্লুন' শব্দটি দ্বারা এই চারটি জিনিসের সবগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এর বাহিরের কোন কিছুকে নয়। কোন মুফাসসীরও এমনটি বলেননি, উপরেই ইমাম ইবনে কাসিরের তাফসির উল্লেখ করেছি (al adiaat ব্লগে পাবেন)।

কাফিরদের মনগড়া থিওরি গ্রহন করা ব্যধিগ্রস্ত মুসলিমরা এর মধ্যে পৃথিবীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এতে তাদের ফায়দা হলো, কাফির মুশরিকদের আকিদার সাথে নিজেদের সমন্বয়সাধনা ইসলাম ও বাতিলের মেলবন্ধন।

কুল্লুন শব্দটি শুধু এই আয়াতেই নয়, আরো অনেক আয়াতে রয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

يَمْزِزُ الْعُلُوفَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَالَمِ فِي فَلَكَ كُلِّ نَّهَارٍ وَلَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ الْيَوْمِ يَسْبَحُونَ

সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।

সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না।

দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সত্তরণ করে।

[ইয়াসিন ৩৮,৪০]

আল্লাহ বলেনঃ

الشَّمْسُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ لَدُنْهُمْ يُجْزِي لَأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ كُلٌّ وَالْقَمَرَ دُونَهُ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ



তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।

[ফাতিরঃ১৩]

وَيَكْوَرُ النَّهَارَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يُكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ ۚ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى كُلُّ وَالْقَمَرَ اللَّيْلُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ ۚ  
তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমশীল।

[যুমারঃ০৫]

ي اللَّيْلُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَمَا تَعْمَلُونَ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ كُلُّ وَالْقَمَرَ  
তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন?

[লোকমান-২৯]

চাঁদ-সূর্যের প্যারালাল (সমান্তরাল) অবস্থানে আবর্তনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়, যখন আল্লাহ চন্দ্রকে সূর্যের পিছনে আসার কথা বলেন। আল্লাহ বলেন:

وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاهَا

শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে[শামসঃ২]

চাঁদ সূর্যকে অনুসরণ করছে, এমনটা নয় যে পৃথিবীকে সূর্য আর পৃথিবীসহ সকল

আসমানি বস্তু সূর্যকে, যেমনটা প্রচলিত বিজ্ঞান আমাদেরকে শেখায়। আল্লাহ বলেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ

তিনি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে একে অপরের অনুগামীরূপে

বানিয়েছেন(১৪:৩৩)

এর দ্বারা প্রমাণ হয় চাঁদ-সূর্য হেলিওসেন্ট্রিক প্যগান কসমোলজি অনুযায়ী সুবিশাল দূরত্বে অবস্থান করছে না, বরং তারা অনেক কাছাকাছি। এতে প্রমাণ হয় চাঁদ ও সূর্যের আকৃতিগত বৈষম্য এতটা বেশি নয় যেটা শেখানো হয়। বরং, তাদের মধ্যকার আকৃতিগত বৈষম্য অনেক কম। চাঁদ-সূর্য পরস্পর সন্নিকটস্থ, পৃথিবীরও অনেক নিকটবর্তী দূরত্বে এদের অবস্থান।

আল্লাহ চাঁদ সূর্য উভয়কেই দুটি সূর্য (একজোড়া) হিসেবে সর্বপ্রথম সৃষ্টি

করেন। আজকের এই চাঁদ মূলত আরেকটি সূর্য ছিল। এটা সূর্যের ন্যয় কিরণ

দিত। পরবর্তীতে চাদের উপর কালিমা লেপন করে তার আলোর মাঝে স্নিগ্ধতা

আনয়ন করা হয়, প্রখরতা কমিয়ে রাতের জন্য উপযুক্ত করা হয়। সূর্য আকারে

চাদের চেয়ে বড় এবং এর আলোর প্রখরতাও বেশি। এ দুটি সূর্যকে যদি

প্রথমাবস্থাতেই রাখা হত তাহলে দিন রাত্রির পার্থক্য করা মুশকিল হত। সূর্যকে আরশের আলো দ্বারা এবং চাঁদকে কুরসির আলো দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। সূর্য আদৌ কোন নক্ষত্র নয়, যেমনটা কাফিররা শেখায়। নক্ষত্র আল্লাহর সম্পূর্ণ ভিন্ন সৃষ্টি। আল্লাহ কুরআনের সবস্থানে চাঁদ সূর্য, দিন-রাত্রি এবং তারকারাজিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেন। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন সৃষ্টি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরশের আলোকে সূর্যালোকের উৎস বানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত হাদিস চাঁদের আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সূর্য আকারে চাঁদের চেয়ে কিছুটা বড়, কিন্তু নূনের পৃষ্ঠে সমতলে বিছানো যমীনের তুলনায় অনেক ছোট। আল্লাহ এর জন্য একটি কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সূর্য সত্যিই উদিত হয় এবং অস্ত যায়। এটা পার্স্পেক্টিভের ইল্যুশন না আদৌ, যেমনটা কাফিররা বলে থাকে। সারা আসমান একবার প্রদক্ষিণ করে পশ্চিম দিকের কালো পানিতে সেটা অস্ত যায়। সূর্য ডুবে যাবার পর সেটা যমীনের তলদেশে চলে যায়। অতঃপর, তা এক আসমান থেকে অপর আসমানে যেতে থাকে, এর পর সর্বোচ্চ আসমানে পৌঁছে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় উদিত হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। অতঃপর যমীনের বিপরীত পূর্বে গিয়ে উদিত হয়। হয়ত, পুরো বিষয়টা অনেক দ্রুত হয়, তাই আমরা একদিকে অস্ত অন্যদিকে উদীত হবার মাঝে সময়ের তেমন কোন পার্থক্য অনুভব করিনা। ওয়া আল্লাহু আ'লাম। যা উল্লেখ করলাম এসব কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক তথ্য, কোন কাফির মুশরিকদের মনগড়া বানীভিত্তিক কিছু নয়।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ “এটা উষঃ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়” (সূরাহ কাহ্ফঃ ৮৬)। [৪০০২]

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০০২

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেনঃ আমি একটি গাধার ওপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ের সাথে ছিলাম। তখন তার উপর একটি পাড়যুক্ত চাদর ছিল। তিনি বলেনঃ এটা ছিল সূর্যাস্তের সময়, তিনি আমাকে বলেনঃ “হে আবু যর তুমি জান এটা কোথায় অস্ত যায়?” তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলেনঃ সূর্যাস্ত যায় একটি কদমাত্ত ঝর্ণায়, সে চলতে থাকে অবশেষে আরশের নিচে তার রবের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, যখন বের হওয়ার সময় আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন, ফলে সে বের হয় ও উদিত হয়। তিনি যখন তাকে যেখানে অস্ত গিয়েছে সেখান থেকে উদিত করার ইচ্ছা করবেন আটকে দিবেন, সে বলবেঃ হে আমার রব আমার পথ তো দীর্ঘ, আল্লাহ বলবেনঃ যেখান থেকে ডুবেছে সেখান থেকেই উদিত হও, এটাই সে সময় যখন ব্যক্তিকে তার ঈমান উপকার করবে না”।

[আহমদ]

সহিহ হাদিসে কুদসি, হাদিস নং ১৬১

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আধুনিক (অপ)বিজ্ঞান অনুযায়ী যেহেতু সূর্য ৯৩মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবী সূর্যের তুলনায় ১৩ লক্ষগুন ছোট, তাই সূর্যের পক্ষে ১৩ লক্ষগুন ক্ষুদ্র যমীনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব ব্যপার। বিষয়টা একেবারেই কল্পনারও অযোগ্য ও

অযৌক্তিক। এজন্য কাফিরদের সাথে সুর মেলানো মুসলিমরা বলে, এ আয়াতের দ্বারা অবজারভারের পার্স্পেক্টিভ থেকে সূর্যকে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখার বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু সূর্য কখনোই ফিজিক্যালি অন্তর্ভুক্ত হয় না, সূর্য তার অবস্থানে স্থির রয়েছে। পৃথিবীই বরং ঘূর্ণনের দরুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ইল্যুশন তৈরি করেছে!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ যুগের মুসলিমরা যেভাবে নিজেদের মত ব্যাখ্যা তৈরি করে নিয়েছে, সাহাবীগন(রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলেছিলেন? নিশ্চয়ই সাহাবীরা(রাঃ) হচ্ছেন হকের মাপকাঠি। তাদের আকিদা ও ব্যাখ্যাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সত্য।

আল্লাহ চাঁদ সূর্য উভয়কেই সৃষ্টি করেন দুটি সূর্য হিসেবে। উভয়ের একই বৈশিষ্ট্যের ফলে রাত দিন আলাদা করা মুশকিল হয়ে ছিল। এজন্য জিব্রাইল(আঃ) এর দ্বারা চাঁদের উপর কালিমা লেপন করে আলো কমিয়ে রাতের উপযোগী করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিম্নতম আসমানে চাঁদ ও সূর্যের জন্য কক্ষপথ নির্ধারন করেছেন। আসমানী সমুদ্রের কক্ষপথে চাঁদ ও সূর্যের জন্য ৩৬০ জন করে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন যারা চাঁদ সূর্যকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ সমতল

পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে ১৮০টি করে উত্তপ্ত কালো পানির জলাশয় তৈরি করেছেন, চাঁদ সূর্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্তগমন করে, তেমনি ১৮০টির মধ্যে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উদিত হয়। শীত ও গ্রীষ্মে উদয়াচল ও অস্তাচলে সূর্যের উদয় অস্তের স্থান পরিবর্তন করে, এতে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে কমে। এজন্য আল্লাহ বলেনঃ

**"তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।"**

(আর রহমান; আয়াত ১৭)

**"আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয় আমি সক্ষম।"**

(আল মা'আরিজ; আয়াত ৪০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমানে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দড়ির ন্যায় পানির কক্ষপথ নির্মান করেন। এতে পানির গতি ধনুকের তীরের ন্যায় । চাঁদ-সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রসমূহ এ কক্ষপথে সন্তরনশীল।

একটা প্রশ্ন আসে, সূর্যের কক্ষপথ প্রথম অথবা চতুর্থ আসমানে হলে কদমাত্ত জলাশয়ে অস্তগমনের পর যমীনের নিচে দিয়ে আরশের নিচে সিঁজদা দিতে কিভাবে যায়? আরশ তো সপ্তম আসমানের উপরে...।

এর উত্তর বেশ কিছু হাদিসে আলাদাভাবে দেওয়া আছে।

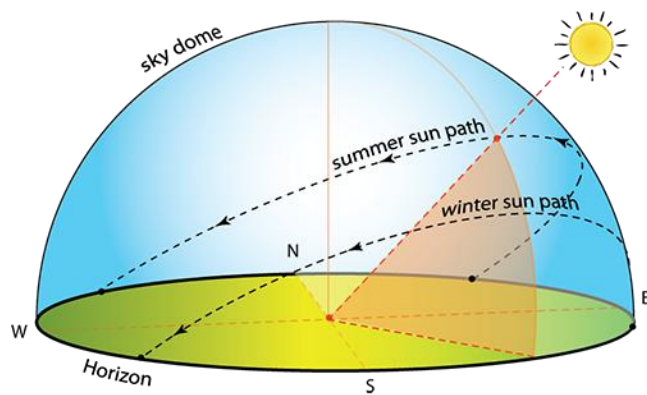
সাত আসমান ও যমীন কুরসির ভেতর। কুরসির উপর আরশ। আরশ সমস্ত সৃষ্টিকে বেঁধে রাখে। তাই যমীনের নিচে গেলেও সূর্য আরশের নিচেই আছে। হয়ত, আসমানের প্রান্তভাগ যমীনের নিচে এমনভাবে আছে যে সূর্যাস্তের সাথে সাথে সে

একেক আসমানের স্তর ভ্রমন করতে থাকে। সেগুলো হয়ত এরূপ যে পরস্পরের মাঝে দূরত্ব কম। সূর্যাস্তের পর এরূপ সাত আসমান ভ্রমন করে আরশের নিচে যাবার কথা কিছু হাদীসে এসেছে। বিষয়টা আমরা যেভাবে বর্ণনা করব সেরকম নাও হতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি সব কিছুই হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই হয়, তবে সেটা আমাদের আকলী জ্ঞানের বাইরে। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কোন কিছু না বুঝে আসার মানে এই নয় যে ওটা এরূপ নয়। কুরআন সুনাহর ব্যপারে আমাদের উচিত এরূপ বিশ্বাস রাখা যে "শুনলাম এবং মানলাম"। ওয়া আল্লাহু আ'লামা

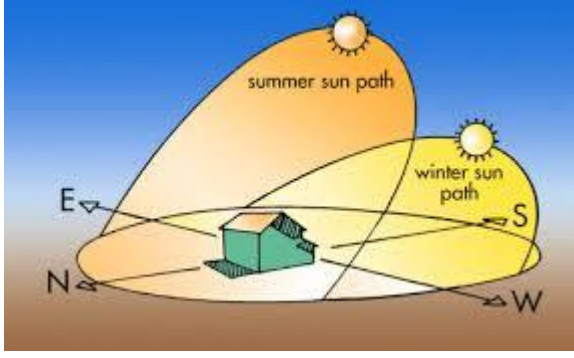
(collected from al-adiat)

Post link: <https://aadiaat.blogspot.com/2019/05/blog-post.html>

RM: আল অদিয়াতের আলোচনা শেষ হলো। আশা করি বুদ্ধিমানরা সূর্যের গতিপথ এবং আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের দিন রাত্রির পার্থক্য কেন হয় তা বুঝে ফেলেছেন। অর্থাৎ উপরন্তু আলোচনা থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।



আর যারা বুঝেননি, তাদেরকে খুব সহজে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। সূরা কাহাফের ১৭ নং আয়াতটা আবারো খেয়াল করুন এবং নিচের সান পথের ছবির সাথে মিলিয়ে নিন।



((তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত!)))

**1** তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিধাবক পাইবে না।  
 তাফসীর : আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গুহার দ্বার বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়কালে যখন উহার আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন উহার ছায়া ডাইন দিকে ঝুকিয়া পড়ে যেমন ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (রা) বলিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, সূর্য যখন বুলন্দ হয় তখন উহার বুলন্দ হওয়ার সাথে সাথে উহার ছায়া পাইতে থাকে এমন কি এই ধরনের স্থানে সূর্য হেলিবার সময় উহার একটু ছায়াও থাকে না এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَإِذَا غَرَبَتُ تَفَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ**। যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বাম দিকের দরজা দিয়ে সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করে। প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তির ডান বামের কথা বলা হইতেছে যে গুহার পূর্ব দিকে অবস্থান করিবে। এই বিষয়টি বুঝা সেই ব্যক্তির পক্ষে সহজ যে ইলমে হাইয়াত **عِلْمُ مَيَّاتٍ** সম্পর্কে এবং সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি স্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল,



**২** যদি গুহার দরজাটি পূর্ব দিকে হইত তবে সূর্যাস্তকালে উহার মধ্যে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করিতো না আর যদি পশ্চিম দিকে উহার দরজা হইত তবে সূর্যোদয়কালে আলো উহাতে প্রবেশ করিত না। আর উহার ছায়া ডান ও বাম দিকে ঝুকিয়াও পড়িত না। পশ্চিম দিকে দরজা থাকিলে সূর্য হেলিবার পূর্বে উহাতে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এবং সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত উহার আলো গুহার মধ্যেই থকিত। অতএব আমরা গুহার দরজার অবস্থান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি উহাই সঠিক। **وَاللَّهُ** অর্থ **تَفَرُّضُهُمْ** হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, **تَشْرُكُهُمْ**

**৩** আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু গুহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তাহা তিনি বলেন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন ফায়দা নাই এবং শরীয়তেরও কোন উদ্দেশ্য উহাতে নিহিত নাই। কিন্তু তবুও কোন কোন মুফাস্সির উহা নির্ণয়ের জন্য কষ্ট করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহারা অধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, গুহাটি 'আয়লাহ' শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, গুহা 'নীনওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, রুমে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, 'বালকা' নামক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই উহার সঠিক স্থান সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অবশ্য উহার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভে কোন দ্বীনী ফায়দা থাকিলে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে অবগত করিতেন।

এবার তাফসীরে ইবনে কাসীরের স্ক্রিন শট দেখুন। ওখানে বলা হয়েছে গুহার মুখটি পূর্ব বা পশ্চিমে নয় বরং বাম দিকে। অর্থাৎ সম্ভবত উত্তর দিকে। আল্লাহ্ আলম। তাহলে সূর্য উদয়ের সময় কিছুটা আলো গুহার মুখ দিয়ে প্রবেশ করে। তারপর সূর্য ডান দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বেঁকে যায়। আবার সূর্য অস্তের সময় দ্বিতীয়বার গুহা মুখে আলো পতিত হয়। অর্থাৎ সূর্য বাম দিকে (কিছুটা উত্তর- পশ্চিম) বেঁকে অস্ত যায়। প্রদত্ত ছবিগুলোতেও আপনারা তাই দেখতে পাচ্ছে। সূর্য উত্তর - পূর্ব দিক থেকে উদয় হয়ে

ডান (দক্ষিণ) দিকে বেঁকে গিয়ে আবার বামে (উত্তর-পশ্চিমে) অস্তু যাচ্ছে। আল্লাহ্ আলম।

## এবার আসুন দেখি আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের দিন ও রাতের পার্থক্য কেন

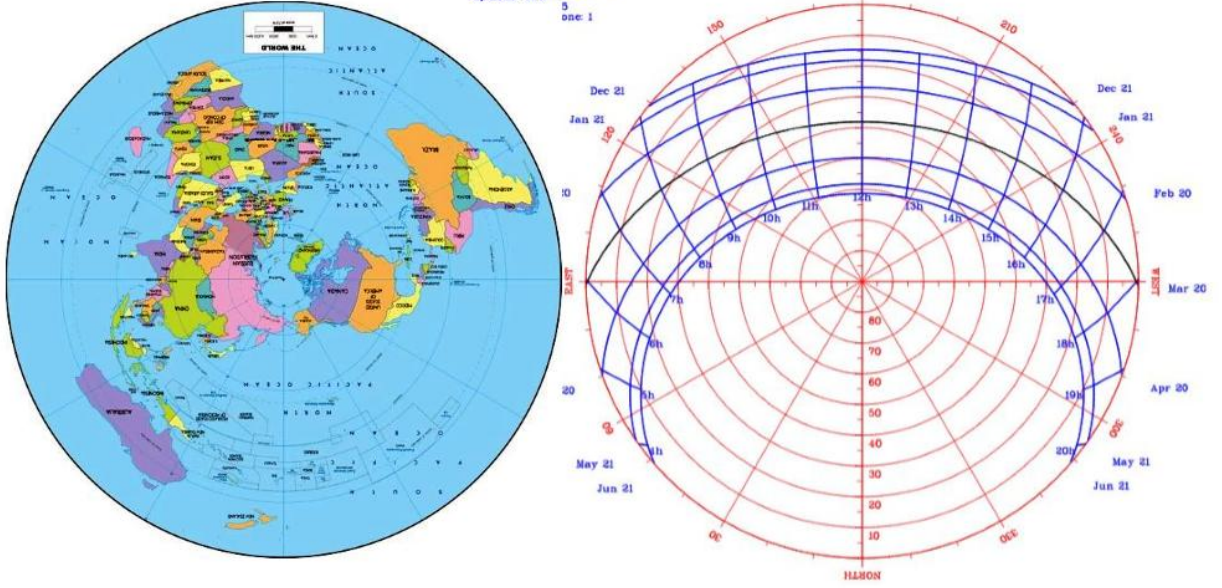
### হয়:

প্রথমেই বুঝতে হবে, দিন রাতের সাথে সূর্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সূর্য ছাড়াও দিন রাত হতে পারে। প্রত্যেকেই আলাদা মাখলুখ। সুতরাং মুমিন হিসেবে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহর হুকুমেই দিন রাতের পার্থক্য হয়। আর যারা ব্যাখ্যা চান তাদের জন্য আরও কিছু কথা সংযোজন করতে হচ্ছে। আল অদিয়াতের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। যারা এটা বিশ্বাস করেননা, তারা তো কখনোই বুঝতে পারবেননা। তারা মনে করেন পৃথিবী সমতল হলে পুরো পৃথিবীতে একসাথে দিন হয়ে যেত। এখানেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।



অথচ বাস্তবতা হলো সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট এবং অনেক কাছে অবস্থিত। এবার জাতিসংঘের সমতল পৃথিবীর ম্যাপ (এই ম্যাপ একদম সঠিক কিনা তা আমরা জানিনা, আল্লাহ্ আলম) ও সূর্যের গতিপথ মিলিয়ে নি। দেখুন আমরা যখন সূর্যকে ডুবে যেতে

দেখি, তখন আমেরিকায় সূর্যকে উদয় হতে দেখা যায়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তাও যদি না বুঝেন তাহলে আপনার মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে একটি অন্ধকার রুমে বিছানার উপরে পরীক্ষা করুন। দেখতে পাবেন একদিকে যখন দিন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আরেকদিকে রাত।



N:B: আমরা যে সূর্যকে ডুবে যেতে দেখি, সেটা পার্সপেক্টিভ (পরিপ্রেক্ষিত)। অর্থাৎ অনেক দূরের জিনিসকে নিচে নেমে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। যেমন আমরা আকাশকে নেমে যেতে দেখি কিন্তু আকাশ নেমে যায়নি। বিষয়টা আরো সহজে বুঝতে পারবেন যখন কোনো হাইওয়ে রাস্তার ল্যাম্প পোস্ট গুলোর দিকে তাকাবেন। তবে হ্যাঁ, সম্পূর্ণ দিন শেষে অর্থাৎ ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট পর সূর্য, কদমাত্ত জলাশয়ে ফিজিক্যালি অস্ত যায়। এসব বিষয় অন্য জায়গায় আলোচনা হয়েছে। আল আদিয়াত রুগের সৃষ্টি তত্ত্বের ১২ টি পর্ব পড়লে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।



যারা বলে পৃথিবী গোল না হলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কিভাবে হয়?  
দেখুন রাস্তার দুই পাশের লাইটগুলো যত সামনে যাচ্ছে ততই নিচের দিকে  
নেমে যাচ্ছে। আর লাইটের সারি দুটিও পরস্পর কাছাকাছি চলে আসছে।  
এভাবে একটা দূরত্বে গিয়ে রাস্তা ও দুই পাশের লাইটের সারি একটা বিন্দুতে  
গিয়ে মিলিত হয়ে গেছে। এরপর আপনি আর কিছু দেখতে পারছেন না।  
আচ্ছা বাস্তবেই কি এরকম হচ্ছে নাকি এটা আপনার চোখের নীতি।  
জি, চোখের ল্যান্সের কারণে এমন দেখতে পান আপনি।  
একইভাবে চিন্তা করুন দিগন্তে আসমান আর জমিন মিলিত হয়ে যায় কেন?  
না আসলেই মিলিত হচ্ছে না, এটা আপনার চোখের নীতি।

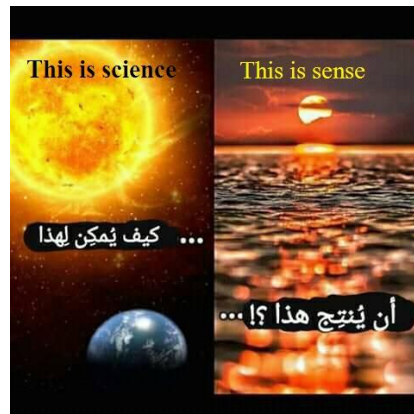
সূর্যোদয়ের সময় সূর্য আপনার কাছে আসতেছে। আর সূর্যাস্তের সময় সূর্য  
আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

২৪ ঘন্টায় সূর্য একবার উদিত হয় উদয়াচল থেকে। একবার অস্ত যায়  
অস্তাচলে। উদিত হওয়ার আগে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর কাছে অনুমতি  
প্রার্থনা করে। কোথায় এই উদয়াচল ও অস্তাচল? আকাশস্থ  
কক্ষপথে.....আল্লাহ্ আলাম



## সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট:

উপরোক্ত পুরো আলোচনা থেকে আমরা আরো একটি তথ্য পেলাম যে, সূর্য পৃথিবী  
থেকে অনেক ছোট। আর এটাই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত। কারণ, সূর্যকে একটি  
লাইট হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। আর পৃথিবীকে বাসস্থান। লাইট কখনো ঘরের চেয়ে  
বড় হয়না। সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট, এই কথাটি মানুষের মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়।  
কারণ নাসা মানুষকে বুঝিয়ে রেখেছে সূর্য অনেক অনেক বড়। অথচ এটা একটা  
কুসংস্কার ছাড়া কিছুই না। কারণ এটার কোনো ভিত্তি, প্রমাণ বা বাস্তবতা কিছুই নেই।  
শুধুই কল্পনা। আর কিছু কাল্পনিক অঙ্ক।



আমরা নিজ চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি সূর্য খুবই ছোট। ইউটিউবে এ সংক্রান্ত অনেক ভিডিও আছে দেখে নিতে পারেন। আর তাছাড়া মেঘ বা বিমান যখন সূর্যের সামনে দিয়ে যায়, তখন ছায়া দেখেই বুঝা যায় যে সূর্য অনেক ছোট। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

### ইসলামের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ: (সকল বিভ্রান্তির নিরসন)

যেহেতু সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কিভাবে এগুলো হয়, সেটা নিয়ে ব্যাপক তর্ক - বিতর্ক ও ভুল বুঝা বুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি অনেকগুলো আটককে এই পোস্টটিতে একসাথে করেছি। আশা করি এখানে সবাই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ। পুরোটা মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ রইলো। প্রথমে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদিস দেখবো। তারপর স্কলারদের ইসলামিক ব্যাখ্যা দেখবো, এরপর বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাটিও দেখবো।



প্রথমে হাদিসগুলো দেখে নেই।

## আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ  
نُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ - لَهُ وَالْقَفْظُ - عَائِشَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،  
دِرَسُولِ الشَّمْسِ فِي عَهْمِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَسَفَتْ  
سَلَّمَ يُصَلِّي فَأُطَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
فَأُطَالَ الْقِيَامَ جَدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ جَدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأُطَالَ الرُّكُوعَ جَدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  
وَعِ الْأَوَّلَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَأُطَالَ الرُّكُوعَ جَدًّا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ  
الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ قَامَ فَأُطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأُطَالَ  
وَنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ يَامَ وَهُوَ ذَا الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأُطَالَ الْقِيَامَ  
رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَدَ  
"قَالَ لِلَّهِ وَأَنْتَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ  
مَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِ  
ةٍ مُحَمَّدٍ إِنَّ مِنْ أَحَدٍ أُغِيرَ رَأْيُهُمَا فَكَبَّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّ  
لَهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ اللَّهُ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمُّهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَالْأَمِنْ  
إِنَّ الشَّمْسَ "ي رَوَايَةِ مَالِكٍ وَفِي . لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَغْتُ "  
" . "مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ .

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে  
একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে লাগলেন। সলাতের মধ্যে তিনি  
বেশ দীর্ঘ এবং বেশ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর রুকু’  
করলেন এবং তা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর আবার রুকু’  
করলেন এবং রুকু’ বেশ দীর্ঘায়িত করলেন, যা রুকু’ থেকে কিছু কম,

অতঃপর সাজদায় গেলেন। সাজদাহ্ থেকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় ক্রিয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া) করলেন। যা প্রথমবার ক্রিয়াম অপেক্ষা কিছুটা কম ছিল। অতঃপর রুকু'তে গেলেন এবং এতে দীর্ঘ সময় কাটালেন। অবশ্য তা প্রথম রুকু' অপেক্ষা কম ছিল। অতঃপর দীর্ঘ রুকু' করলেন, অবশ্য তা প্রথম রুকু'র চেয়ে কম ছিল। অতঃপর সাজ্জদাহ করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত শেষ করলেন। এতক্ষণে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি লোকদের সামনে খুতবাহ্ দিলেন। খুতবাহ্ প্রসঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দু'টি নিদর্শন। আর চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না। অতএব তোমরা যখন চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবীর পড় আর আল্লাহর কাছে দু'আ কর এবং সলাত আদায় কর ও সদাক্বাহ্ কর। হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! মনে রেখ, এমন কেউ নেই যে মহান আল্লাহ থেকে অধিক আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, যখন তার দাস বা দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (তখন তিনি শাস্তি না দিয়ে থাকেন না)। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা অবশ্যই অধিক পরিমাণে কান্না-কাটি করতে এবং খুব কম হাসতে। আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? মালিকের রিওয়াযাতে এ বাক্যটি

এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে- সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর বিশেষ কুদরাতের নিদর্শনাবলী। (ই.ফা. ১৯৫৯, ই.সে. ১৯৬৬)

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

لَمْ، قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسَدِّ رُوَّة، عَنْ عَائِشَةَ، نَ شَيْهَابِ الزُّهْرِيِّ، يُخْبِرُ عَنْ عَابُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابِ سلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا أَنَّ الشَّمْسَ، خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ بَعَ رَكْعَوْصَلَّى أُرْ . فَأَجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ . "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ " وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এ ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলেন: (আরবী) “জামা‘আতে সলাত” অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (ঘোষণা শুনে) সবাই একত্রিত হলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করলেন। দু’ রাক‘আতে চারটি রুকু’ ও চারটি সাজদাহ্ করলেন। (ই.ফা. ১৯৬২, ই.সে. ১৯৬৯)

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিঃ আল্লাহ্ তা‘আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের হুঁশিয়ার করেন।



وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আবু মূসা আশ‘আরী (রাযি.) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তা বর্ণনা করেছেন।

১০৪৮. আবু বাকরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু’টির গ্রহণ হয় না। তবে এ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ওয়ারিস, শু‘আইব, খালিদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ, হাম্মাদ ইবনু সালাম (রহ.) ইউনুস (রহ.) হতে ‘এ দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন’ বাক্যটি বর্ণনা করেননি; আর মূসা (রহ.) মুবারক (রহ.) স্থলে হাসান (রহ.) হতে ইউনুস (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবু বাকরা (রাযি.) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ এ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। (১০৪০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯৮৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৯১)

**সূর্যগ্রহণের সময় ক্রীতদাস মুক্ত করা পছন্দনীয়:**

১০৫৪. আসমা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ

দিয়েছেন। (৮৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৯৬)

এবার আমরা কয়েকটি আর্টিকেল পড়বো, ইনশাআল্লাহ।

## Article - 1

### ইসলামের দৃষ্টিতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে এতদুয়ের ওপর একটি ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর সৃষ্টি। এর প্রমাণস্বরূপই আল্লাহ এ দুটোর ওপর ‘গ্রহণ’ দান করেন। আর এই দুটি আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন বৈ অন্য কিছুই নয়।

হাদিস বিশারদ ও ইসলামের গবেষকরা বলেছেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সতর্কবাণী পৌঁছে দেয় যে, অন্যান্য সৃষ্টির মতো চন্দ্র-সূর্যও আল্লাহর মাখলুক; এরা উপাসনার যোগ্য নয়। এ দুটি যেহেতু নিজেরাই বিপদাক্রান্ত হয়, তাই এগুলো উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। বরং এ দুটিকে মহান আল্লাহকে চেনার মাধ্যম গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

আল্লাহ বলেছেন, ‘তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, আর চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে

শুধু তারই ইবাদত করে থাকো’ (সূরা হা-মিম সিজদা, আয়াত : ৩৭)

জাহিলি যুগে মানুষের ধারণা ছিল, কোনো মহাপুরুষের জন্ম-মৃত্যু বা দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির বার্তা দিতে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। ইসলাম এটাকে একটি ভ্রান্ত ধারণা আখ্যায়িত করেছে। ‘গ্রহণ’-কে সূর্য ও চন্দ্রের ওপর একটি বিশেষ ক্রান্তিকাল বা বিপদের সময় গণ্য করেছে।

এ কারণে সূর্য বা গ্রহণের সময় মুমিনদের অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেন এ সময়ে আল্লাহর তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। দোয়া, নামাজ ও আমল ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে।

### হাদিসের আলোকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

মুগিরা ইবনু শুবা (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সা.) - এর পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যুর দিনটিতেই সূর্যগ্রহণ হয়। তখন আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম যে, নবিপুত্রের মৃত্যুর কারণেই এমনটা ঘটেছে। আমাদের কথাবার্তা শুনে রাসুল (সা.) বলেন, ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটি নিদর্শন, কারোর মৃত্যু বা জন্মের ফলে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না’ (বুখারি, হাদিস : ১০৪৩; মুসলিম, হাদিস : ৯১৫)

আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাসুল (সা.) - এর কাছে ছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসুল (সা.) তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করেন। আমরাও প্রবেশ করি। তিনি আমাদের নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু’রাকাত নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, ‘কারও মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ

কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করবে এবং দোয়া করতে থাকবে’  
( বুখারি, হাদিস : ৯৮৩)

আবু মুসা ( রা. ) বলেন, রাসুল ( সা. ) - এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এই আশঙ্কায় উঠে দাঁড়ালেন যে, কিয়ামতের মহাপ্রলয় বুঝি সংঘটিত হবে। তিনি দ্রুত মসজিদে চলে আসেন। এরপর অত্যন্ত দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদার সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। আমি আর কোনো নামাজে কখনো এমন ( দীর্ঘ ) দেখিনি। এরপর রাসুল ( সা. ) বলেন, ‘আল্লাহর এসব নিদর্শনাবলি কারও মৃত্যুর কারণে হয় না, কারও জন্মের কারণেও হয় না। তিনি এগুলো প্রেরণ করেন তার বান্দাদের সতর্ক করার জন্য। যখন তোমরা এসব নিদর্শনাবলির কিছু দেখতে পাও তখন তোমরা আতঙ্কিত হৃদয়ে আল্লাহর জিকির- স্মরণ, দোয়া ও ইস্তিগফারে ব্যস্ত হও। ( মুসলিম, হাদিস : ১৯৮৯)

## Article - 2

### আল কোরআনের আলোকে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

বছরে দুইবার সূর্যগ্রহণ হয় এবং দুইবার চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই গ্রহণ কখনো পূর্ণ গ্রাস রূপে দেখা দেয়। আবার কখনো আংশিক গ্রাস হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ মূলত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কুদরতে কামেলার বহিঃপ্রকাশ, যা এ দু’ টি নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্কের অবলুপ্তি বা ভূমন্ডলের বিলয় প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আরবী ভাষায় সূর্যগ্রহণকে ‘ কুসুফ ’ বলা হয়। ব্যবহারিক অর্থে সূর্যের

আলোকরশ্মি বিপিরণের পথে অন্ধকারের ছায়া নিপতিত হওয়াকে কুসুফ বলা হয়। আরবীতে বলা হয় ‘ইনকেসাফুস শামস’ অর্থাৎ সূর্য অন্ধকারের ছায়ায় আপতিত হয়েছে বা ঢাকা পড়েছে। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : ‘তারা আকাশের কোনো খন্ড ভেঙে পড়তে দেখলে বলবে এটা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘা’ - সূরা তুর : আয়াত ৪৪।

পুঞ্জীভূত মেঘ যেমন কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্নরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি গ্রহণ চলাকালে সূর্যকেও কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যায়। অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : (কাফেররা বলে) ‘অথবা তুমি যেমন বলে থাক তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। অন্যথায় আমরা তোমার ওপর ঈমান আনয়ন করব না।’ এই আয়াতে কারিমায় ‘কিসাফান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একই অর্থজ্ঞাপক আয়াত সূরা শোয়ারাতেও এসেছে। ইরশাদ হয়েছে : ‘তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আকাশের একখন্ড আমাদের ওপর ফেলে দাও’ - সূরা শোয়ারা : আয়াত ১৮০। শুধু তা-ই নয়, সূরা রুমেও কিসাফান শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে : আল্লাহ তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। তারপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে একে খন্ড-বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা হতে বারিধারা নির্গত হয়, তারপর যখন তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছে দেন, তখন তারা হর্সোৎফুল্ল হয়। - সূরা রুম : আয়াত ৪৮।

তাছাড়া সূরা সাবা এর মধ্যেও কিসাফান শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে : ‘ তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও জমিনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরসহ ভূমি ধসিয়ে দিতে পারি অথবা তাদের ওপর আকাঙ্ক্ষা পতন ঘটাতে পারি, আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। - সূরা সাবা : আয়াত ৯। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে ‘ কিসাফান’ ও ‘ কিসাফান’ শব্দদ্বয় আসলে ‘ ইনকিসাফুস শামস’ অর্থাৎ সূর্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করে। যাকে আমরা সূর্যগ্রহণ বলে জানি।

আর চন্দ্রগ্রহণকে আরবীতে ‘ খুসুফ’ বলা হয়। সূর্য যেমন অন্ধকার ছায়ার আবর্তে পতিত হয়ে অন্ধকার হয়ে যায়, তেমনি চন্দ্রও বছরে দুইবার স্থায়ী কক্ষপথে পরিভ্রমণরত অবস্থায় অন্ধকারের ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। ইহার আংশিক রূপ কখনো দৃশ্যমান হয়। আবার কখনো সার্বিক রূপ পরিদৃষ্ট হয়। কালো রঙ বা অন্ধকারের এই হাতছানিকেই চন্দ্রগ্রহণরূপে আখ্যায়িত করা হয়। বস্তুত চন্দ্রগ্রহণের বিষয়টি আল কোরআনে মহান আল্লাহ পাক নিজেও উল্লেখ করেছেন, ইরশাদ হয়েছে : যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার পথ কোথায়? - সূরা কিয়ামাহ : ৭, ৮, ৯ ও ১০। এখানে চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়ার বাস্তব রূপই হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ, যা বছরে দুইবার হয়ে থাকে। এতদ প্রসঙ্গে আরও ইরশাদ হয়েছে : ‘ তারপর

আমি কারুনকে এবং তার প্রাসাদকে ভ, গর্ভে প্রোথিত করলাম’ - সূরা কাসাস : আয়াত ৮১। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন : যদি আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরও তিনি ভ, গর্ভে প্রোথিত করতেনা’ - সূরা কাসাস : আয়াত ৮২। বস্তুত ভ, গর্ভে প্রোথিত হলে বা প্রোথিত করলে প্রতিটি বস্তুই যেমন অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যায়, তেমনি গ্রহণের সময়ও চাঁদ ও সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়তে থাকে। আলোহীন ও বিবর্ণ রূপ ধারণ করে। মূলত চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ বিশ্ব মানবতাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমগ্র সৃষ্ট জগত অবশ্যই একদিন অন্ধকার ও বিলয়প্রাপ্ত হবে। এর কোনো অন্যথা হবে না।

## Article – 3

### এই সম্পর্কিত আরো কিছু হাদিস ও আমল (করণীয়-বর্জনীয়)

চন্দ্র, সূর্য, এই আসমান, জমিনসহ সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ তাআলার কুদরতের দুটি অন্যতম নিদর্শন। মোটকথা সবকিছুই আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের নিশানা। জাহিলিয়াতের যামানায় লোকেরা মনে করত বড় কোনো ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে মনে হয় সূর্যগ্রহণ লাগে। মুগিরা ইবনু শু’বা (রা. ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা. ) এর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনটিতে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন আমরা সকলে বলাবলি করছিলাম যে, নবীপুত্রের

মৃত্যুর কারণেই এমনটা ঘটেছে। আমাদের কথাবার্তা শুনে রাসুল (সা.)

বললেন:

إِذَا فِ لِحَيَاتِهِ، وَلَا أَحَدٍ لِمَوْتٍ أَنْ يَنْخَسِفَ لَا إِلَهَ، آيَاتٍ مِنْ آيَاتِنَا وَالْقَمَرَ الشَّمْسُ إِنَّ  
وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا وَكَبِّرُوا اللَّهَ فَادْعُوا ذَلِكَ رَأَيْتُمْ

অর্থ: সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ করবো তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সলাত আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবো ( বুখারি ও মুসলিমা)

### সূর্যগ্রহণের নামায

রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কে অনেকগুলো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের নামায সুন্নাতা জামাতের সঙ্গে আদায় করাও সুন্নাতা

### সালাতুল কুসুফের সময়:

আবু বাকরাহ (রা.) বলেন-

لِيَصِدَّ النَّبِيُّ فَقَامَ الشَّمْسُ كَسَفَتْ فَأَذَى وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عِنْدَ كُنَّا  
حَتَّى يُنْزِلَ رَكْعَتَيْنَا فَصَلَّى ۖ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ دَخَلَ حَتَّى رَدَّاهُ يَجُرُّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ  
أَنْ يَنْكَسِفَ لَا وَالْقَمَرَ الشَّمْسُ نَا : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى فَقَالَ ۖ الشَّمْسُ انْجَلَتْ  
بِكُمْ مَا كُشِفَ حَتَّى وَادْعُوا فَصَلُّوا رَأَيْتُمُوهَا فَإِذَا ۖ أَحَدٍ لِمَوْتٍ

একবার আমরা রাসুল (সা.) এর কাছে থাকাকালে সূর্যগ্রহণ শুরু হলো।

তখন রাসুল (সা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং পরিহিত চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের



নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং গ্রহণ ছেড়ে গেলো। তিনি বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কারো মৃত্যুর কারণে কখনও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ দেখবে তখন অবস্থাটি থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দোয়ায় মগ্ন থাকবে। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীস থেকে বোঝা গেলো, সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের নামাযের ওয়াত্ত হলো, গ্রহণ লাগা থেকে নিয়ে গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত। তাই যথাসম্ভব সালাতুল কুসুফ দীর্ঘ হওয়া চাই। রাসুলুল্লাহ (সা.) কুসুফের নামায দীর্ঘ কেরাত, দীর্ঘ রুকু, দীর্ঘ সিজদার মাধ্যমে আদায় করতেন।

### সালাতুল কুসুফের নিয়ম:

সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের নামায ২ রাকাত। অন্য সাধারণ নামাযের মতই এই নামায আদায় করতে হয়। যদিও প্রতি রাকাতে ২ রুকু, ৩ রুকু এমনকি ৪ রুকুর মাধ্যমে ব্যতিক্রমী নিয়মে এই নামায পড়ার বিবরণও এসেছে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে সাধারণ নিয়মে ২ রাকাত নামায আদায়ই বিধেয়। দলিল এবং যুক্তির আলোকে এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

আযান- ইকামত ছাড়া মাকরুহ ওয়াত্ত ব্যতীত মসজিদে এই নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করা সুন্নাত। তবে দিনের নামায হওয়ার কারণে কিরাত আন্তে পড়াই নিয়ম। হাদীস এবং যুক্তির আলোকেই এটাই বাস্তবসম্মত। সাহাবি হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন-

لَا رَكْعَتَيْنِ، الشَّمْسُ كُسُوفٌ فِي مَوْسَلٍ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ بَنِي صُلَيْ  
صَوْتًا فِيهِمَا لَهُ نَسْمَعُ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে ২ রাকাত সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন, কিন্তু উভয় রাকাতে আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে কোনো

আওয়াজ শুনি নাই। (আবু দাউদ: ১১৮৪, নাসাঈ: ১৪৮৪, তিরমিযী: ৫৬২, ইবনে মাজাহ: ১২৬৪)

مَعَ أَسَدٍ فَلَمَّ الشَّمْسُ، كَسِفَتْ وَحَمِيٍّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ جُنُبٌ إِلَى كُنْتُ قِرَاءَةً لَهُ.

অর্থ: আমি সূর্যগ্রহণের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পাশে দাঁড়িয়েছি (নামায আদায় করেছি), কিন্তু রাসুল (সা.) থেকে কিরাত শুনি নি (তাবারানী: ১১৬১২)

এখান থেকে বোঝা গেলো সালাতুল কুসুফে কিরাত আন্তে হবো তবে সশব্দে কিরাত পড়াও জায়েয আছে।

সালাতুল কুসুফে ‘গ্রহণ’ শেষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ নামায পড়া সুন্নাত। তবে গ্রহণ শেষ হবার আগে নামায শেষ করে নেয়াতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে বাকি সময়টুকু যিকির, দুআ, ইস্তেগফার করে কাটানো উচিত।

### চন্দ্রগ্রহণের নামায

রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে চন্দ্রগ্রহণের নামাযও প্রমাণিত রয়েছে। তবে হানাফী মাযহাব মতে সালাতুল খুসুফ জামাতের সঙ্গে নয়, বরং একাকি নিজ ঘরে পড়াই নিয়ম। তাই চন্দ্রগ্রহণের সময় আমাদেরও নিজ নিজ ঘরে একাকি চন্দ্রগ্রহণের নামায আদায় করা উচিত। এবং এটা সুন্নাতও।

وَحَدَّثَنَا يُصَلُّوْا أَنْ يَهَافِ السُّنَّةُ لِأَنَّ مَنَازِلَهُمْ فِي قِيَصْلُونِ الْقَمَرِ خُسُوفٍ فِي أَمَّا

অর্থ: চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘরে নামায আদায় করা হবো কেননা সুন্নাহ হচ্ছে, তখন একাকি নামায পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে’: ১/ ২৮২)

### নারীদের করণীয়:

নারীরাও সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘরে একাকি নামায আদায় করবেন। গ্রহণের বাকি সময়টুকু যিকর- আযকার ও তাসবিহ- তাহলিলে মাশগুল থাকবেন।

### সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ- কেন্দ্রিক কুসংস্কার

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে কিছু কুসংস্কার, বিভ্রান্তি ও অমূলক ধারণা রয়েছে। ‘এ সময় খাওয়া- দাওয়া করা যাবে না’। ‘গর্ভবতী মায়েরা ঘরের কাজকর্ম করতে পারবে না’। সমাজে আরো নানা রকমের কুসংস্কারমূলক কথা প্রচলিত রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মায়ের ভয় কিংবা আশঙ্কার কিছু নেই। অন্যদিনের মতো পানাহারসহ স্বাভাবিক সব কাজকর্ম করতে পারবেন। লোকমুখে যা শোনা যায়, সব ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার।

‘গ্রহণ’কে ঘিরে এমন বিশ্বাসও রয়েছে, যে কথাগুলোর উপর বিশ্বাস রাখলে ঈমানের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। মোটকথা এ সময় শরীয়ত কারো জন্যে কোনো বাধ্যবাধকতা বা কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে নি। তাই এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্যে কর্তব্য।

### Article – 4

#### বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার সাথে সমন্বয় :

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রক্রিয়া। চাঁদ যখন পরিভ্রমণ অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, তখন পৃথিবীর কোনো দর্শকের কাছে কিছু সময়ের জন্য সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই সূর্যগ্রহণ।

(Solar eclipse) বা কুসুফা আর পৃথিবী যখন তার পরিভ্রমণ অবস্থায় চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, তখনই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চাঁদ কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই চন্দ্রগ্রহণ (Lunar eclipse) বা খুসুফা।

নবীজি (সা.) তাঁর উম্মতকে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণে আতঙ্কিত হয়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানও বলছে যে সত্যি চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর জন্য আতঙ্কের বিষয়। সৌরজগতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবলয়ে অ্যাস্টেরয়েড (Asteroid), মিটিওরাইট (Meteorite), উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পাথরের এক সুবিশাল বেল্ট আছে বলে বিজ্ঞানীরা ১৮০১ সালে আবিষ্কার করেন। এ বেল্টে ঝুলন্ত একেকটা পাথরের ব্যাস ১২০ থেকে ৪৫০ মাইল। গ্রহাণুপুঞ্জের এ পাথরখণ্ডগুলো পরস্পর সংঘর্ষের ফলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড প্রতিনিয়ত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু সেগুলো বায়ুমণ্ডলে এসে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু গ্রহাণুপুঞ্জের বৃহদাকারের পাথরগুলো যদি পৃথিবীতে আঘাত করে, তাহলে ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন হবে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সমান্তরালে, একই অক্ষ বরাবর থাকে বলে এ সময়ই গ্রহাণুপুঞ্জের ঝুলন্ত বড় পাথরগুলো পৃথিবীতে আঘাত হানার আশঙ্কা বেশি। বৃহদাকারের পাথর পৃথিবীর দিকে ছুটে এলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পক্ষে তা প্রতিহত করা অসম্ভব। ধ্বংসই হবে পৃথিবীর পরিণতি।

-----

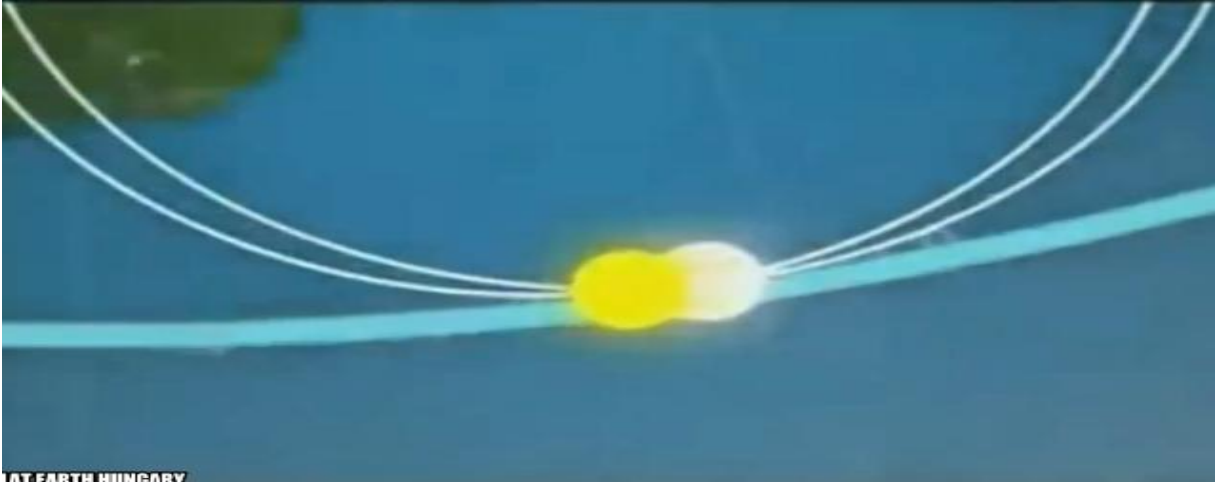
সংযোজন: উপরোক্ত পুরো আর্টিকেলটি থেকে আমরা যা বুঝলাম, তা হলো মুমিন হিসেবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সময় এটাকে আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন হিসেবে ভয় পেয়ে নামাজে দাঁড়াতে হবে। তার পর আমরা এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কথা চিন্তা করবো। আর এই আর্টিকেলটি সেভাবেই সাজানো হয়েছে। প্রথমেই মুত্তাকী মুমিনদের জন্য নিদর্শন, ভয় ও আমলের হাদীসগুলোকে আনা হয়েছে। তারপর ইসলামিক ব্যাখ্যা। এরপর যারা আরেকটু বেশি জানতে চায়, তাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাক্ষাটাও দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ তিন শ্রেণীর মুমিনের জন্যই আলোচনা রাখা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সমতল পৃথিবীতে এটা কিভাবে সম্ভব? অসম্ভবের কিছু নেই। চাদ ও সূর্য দুটোই প্রায় একই আকৃতির। সুতরাং একটা আরেকটার সামনে চলে আসলে, গ্রহণ হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। বিষয়টা আরো ভালো করে বুঝতে চাইলে এই ভিডিওটি (**FLAT EARTH - ECLIPSE**

[https://www.facebook.com/watch/?comment\\_id=773297463496817&v=976324746088547&notif\\_id=1597544483627062&notif\\_t=comment\\_mention](https://www.facebook.com/watch/?comment_id=773297463496817&v=976324746088547&notif_id=1597544483627062&notif_t=comment_mention))

দেখতে পারেন। তবে এখানে যেই (round) মডেলটা দেখানো হয়েছে, সেটা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক আছে। এটা শুধু এজন্যই দেখতে বলছি, যেন বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারেন। এটাকে চূড়ান্ত মডেল হিসেবে না নেয়ার অনুরোধ রইলো।



আল্লাহ আমাদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

**চাঁদ সূর্য পৃথিবী একই সরলরেখায় এসে গেলে চন্দ্র সূর্য গ্রহন হয় এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা।**

আল্লাহ চন্দ্র জন্য বারটি মঞ্জিল এবং সূর্যের জন্য বারটি বুরুজ স্থাপন করেছেন। যখন চন্দ্র অথবা সূর্য একে অপরের বুরুজ অথবা মঞ্জিল কে অতিক্রম করে তখন পৃথিবীতে গ্রহণ দৃশ্যমান হয়।

সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে যদি চন্দ্র একই সরলরেখায় এসে যেত তাহলে গ্রহণ দেখার

পূর্বে আমরা আগে চন্দ্রকে দেখতে পেতামা তাই আধুনিক বিজ্ঞানের এই তথ্যটা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং সত্যের পরিপন্থী।

আরবি ভাষায় সূর্যগ্রহণকে ‘কুসুফ’ বলা হয়। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে ‘কিসাফান’ ও ‘কিসফান’ শব্দ দিয়ে ‘ইনকিসাফুস শামস’ অর্থাৎ সূর্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যাকে আমরা সূর্যগ্রহণ বলে জানি।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে এতদুয়ের ওপর একটি ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি এর প্রমাণস্বরূপ

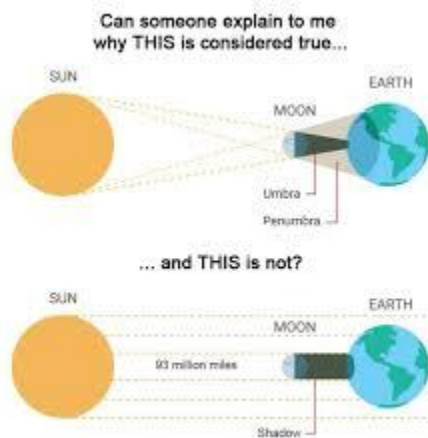
আল্লাহতায়ালা এ দু’টোর ওপর ‘গ্রহণ’ দান করেন। আর এই দু’টি আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন বৈ অন্য কিছু নয়।

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সতর্কবাণী পৌঁছে দেয় যে, অন্যান্য সৃষ্টির মতো চন্দ্র-সূর্যও আল্লাহর সৃষ্টি; এরা উপাসনার যোগ্য নয়। চন্দ্র-সূর্যইতো বিপদাক্রান্ত হয়, তাই এগুলো উপাস্য হতে পারে না। বরং এ দু’টিকে আল্লাহতায়ালাকে চেনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করাই হলো- বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, আর চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু তারই ইবাদত করে থাকো।’ (-সূরা হা-মিম সিজদা: ৩৭)

অন্ধকার যুগে মানুষের ধারণা ছিল, কোনো মহাপুরুষের জন্ম-মৃত্যু বা দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির বার্তা দিতে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। ইসলাম এটাকে একটি ভ্রান্ত ধারণা আখ্যায়িত করেছে। গ্রহণকে সূর্য ও চন্দ্রের ওপর একটি বিশেষ ক্রান্তিকাল বা বিপদের সময় গণ্য করেছে।

হাদিসের সূর্যগ্রহণ প্রসঙ্গে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত মুগিরা ইবনে শুবা(রা.) বলেন, ‘হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যুর দিনটিতেই সূর্যগ্রহণ হয়। তখন আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম যে, নবী করিম(সা.)-এর পুত্রের মৃত্যুর কারণেই এমনটা ঘটেছে। আমাদের কথাবার্তা শুনে হজরত রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনগুলোর মধ্যে দু’টি নিদর্শন, কারও মৃত্যু বা জন্মের ফলে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না।’ —সহিহ বোখারি: ১০৪৩

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবু বকর(রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হজরত রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। হজরত রাসূলুল্লাহ(সা.) তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করেন। আমরাও প্রবেশ করি। তিনি আমাদের নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু’রাকাত নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, কারও মৃত্যুর কারণে কখনও সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করবে এবং দোয়া করতে থাকবে।’ —সহিহ বোখারি: ৯৮৩





## গ্রহনের সময় ফেরেশতারা চাদ সূর্য কে পানিতে ডুবিয়ে রাখে একথা কি সত্য?

এটা ভুল এবং মিথ্যা।

সূর্য কি পানিতে ডুবিয়ে রাখার বস্তু নাকি? তাছাড়া পানি অনেক স্বচ্ছ অপরদিকে সূর্যের আলো অনেক তীক্ষ্ণ ও তীর্থকা সূর্য এতটাই তেজস্বী যে সেটা দূর আকাশ থেকে পৃথিবীর পানিকে শোষণ করে নেয়, তখন গরম ধাতব পদার্থের উপর পানি দিলে অনেক সময় বায়বীয় পদার্থ দেখা যায় যেটাকে আমরা ধোয়া বলি। আর সরাসরি সূর্যকে পানিতে ডুবালে, সূর্য আড়াল হয়ে যাবো।

তাছাড়া যখন গ্রহণ দেখা যায় সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এক রকম দেখা যায় না, কিন্তু কোন বস্তু পানিতে ডুবালে সেটা সব দিক থেকে একই রকম দেখা যাবো। অদৃশ্যের সংবাদ নস কথা কোরআনের আয়াত অথবা সহি মারফু হাদীস ছাড়া গ্রহণ করা উচিত নয়।

## সাইন্টিস্ট রা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ এর সময়কাল আগের থেকে কিভাবে বলে? তাহলে কি তারা চাদ সূর্যের মঞ্জিলগুলোর সম্পর্কে অবগত?

চাঁদ এবং সূর্যের মঞ্জিল বুরুজ আদিকাল থেকেই হিসেব করে রাখা হতো। অতীতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এসংক্রান্ত অনেক জ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে মুসলিম মনীষীদের সবচেয়ে বেশি পারদর্শী ছিল।

আপনি নিশ্চয়ই মায়া সভ্যতার কথা শুনেছেন? এরকম অনেক হারিয়ে যাওয়া

জাতিরা অনেক আগে থেকেই তাদের ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করে নিতে পারত। আরব ও পার্সিয়ান, গ্রিক ও ভারতীয়রা তারা তাদের ক্যালেন্ডার এভাবে নির্ধারণ করত। বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের ক্যালেন্ডার এটা তো বেশি আগের কত কথা না। তারা নাসার উপর নির্ভর করে ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে না। তারা হিসাব নিকাশ করেই করে।

আদিকালের কিছু ছক পাওয়া যায় চন্দ্রের মঞ্জিল ও সূর্যের বুরুজের। ছক দেখে বলে দেওয়া যায় এটা তো কঠিন কাজ না আবার একেবারে সহজ কাজ না। আপনি রাশিচক্রের উপর পুরাতন কোন বই পেলে আশা করি সেই ছক দেখতে পাবেন।

হিসেব গুলো কিভাবে করা হয়? কিসের ভিত্তিতে করা হয়?

এগুলার ছক ও নকশা আছে। ওই নকশার মধ্যে 12 টি রাশি ও সাতাশটি নক্ষত্র কখন কোন দিন কোন সময়ে উদয় অস্ত হবে ছবি দেখলে বোঝা যায়। হিসাবটা করতে হয় বাংলা মাসের 1 তারিখ থেকে যদি আপনি বাংলা ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করেন।



### সূর্য কোন আকাশে অবস্থিত ?

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জীবন যাপনের জন্যে তাবৎ জিনিসপত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সাতটি আকাশ ও সাতটি জমিন। অতপর তিনি প্রথম জমিনকে সাজিয়েছেন গাছ-গাছালী, তরু-লতা, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত ও ঝর্ণাধারা দিয়ে। অনুরূপভাবে তিনি প্রথম আসমানকে সাজিয়েছেন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি, মেঘখণ্ড-বায়ুমণ্ড ও রংধনু দিয়ে। তন্মধ্যে চন্দ্র সূর্য আমাদের সীমাহীন উপকারী বস্তু। আর সেই চন্দ্র সূর্য নিয়ে আমাদের মনে কতই না কৌতুহল!

## আকাশ সাতটি।

১ম আকাশের নাম রাকীয়াহ। এটি সাদা বরফের তৈরী। কাফ পর্বতের নিকটে হওয়ায় তা নীল রঙ্গের দেখা যায়।

২য় আকাশের নাম হলো ফাসদারুম বা মাউন। এটি সাদা মোতির তৈরী।

৩য় আকাশের নাম হলো মালাকুত বা হারিউন। এটি লোহার তৈরী।

৪র্থ আকাশের নাম হলো যাহেরাহ। এটি তামার তৈরী।

৫ম আকাশের নাম হলো মুয়াইয়্যানাহ বা মুসাহহারাহ। এটি রূপার তৈরী।

৬ষ্ঠ আকাশের নাম হলো খালেসাহ। এটি স্বর্ণের তৈরী।

৭ম আকাশের নাম হলো লাবিয়াহ বা দামিয়া। এটি সবুজ যমরুদ পাথরের তৈরী।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী ৬/৩০, মুকাশাফাতুল কুলুব ১/২২৭)

চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রাজির অবস্থান সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে বলেনঃ

ال قمر علوج. ط باقا سموات سد بع الله خلق ك يف ت روا الم  
. سراجا ال شمس جعل ذوراو ف يهن .

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ তায়ালা কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে

স্তরে? এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন

করেছেন প্রদীপ রূপে। (সূরাহ নূহ ১৫-১৬ নং আয়াত)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

وهلجا سراجا وجعلنا. شدادا سد بعاف وق كم وب ذينا .

আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি একটি

উজ্জ্বল প্রদীপ। (সূরাহ নাবা ১২-১৩ নং আয়াত)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

- الْكَوَاكِبِ زِينَةُ الدُّنْيَا السَّمَاءَ زِينًا إِنَّا

নিশ্চয় আমি সর্বনিম্ন আসমানকে

তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (সূরাহ সাফফাত ৬ নং আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

-بِمَصَابِيحِ الدُّنْيَا السَّمَاءَ زِينًا وَلَقَدْ

আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি (সূরাহ মুলক ৫ নং আয়াত)

এই আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্র সূর্যসহ যাবতীয় তারকারাজির অবস্থান সর্বনিম্ন

আসমান অর্থাৎ প্রথম আসমানে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিঃ বলেনঃ চন্দ্র সূর্য ও

তারকারাজির সবকিছুই সর্বনিম্ন আকাশে অবস্থিত। তাফসীরে মাযহারীতেও বলা

হয়েছে যে, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্র প্রথম আকাশের নীচে। (মাযহারী

১২/৬১, মুকাশাফাতুল কুলুব ১/২২৮, ফাসাসুন নাবিয়্যিন ১/৭৩)

অপরদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

فَلَكَ فِي وَكُلِّ النَّهَارِ سَائِقُ اللَّيْلِ وَلَ الْقَمَرَ تُدْرِكُ أَنْ لَهَا يَنْبَغِي الشَّمْسُ لَا

-يَسْبَحُونَ

অর্থঃ না সূর্যের সাধ্য আছে সে চন্দ্রের নাগাল পাবে, না চন্দ্রের সামর্থ আছে সে

সূর্যকে অতিক্রম করবে। প্রত্যেকেই তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। (সূরাহ

ইয়াসিন ২০ নং

আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান তাদের নিজস্ব "ফালাক" এর

মধ্যে,যেখানে তারা পরিভ্রমণ করে। আর ফালাক শব্দের তাফসীর হলো আসমান ও  
 যমিনের মধ্যবর্তী ঐ কক্ষপথ যা দিয়ে তারকারাজি পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র সূর্যের বারটি  
 করে কক্ষপথ রয়েছে এবং আটাইশটি করে মঞ্জিল রয়েছে। (তাফসীরে তাবারী  
 ২০/৫১৭, তাফসীরে জালালাইন ৫/৩৪২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় চন্দ্র সূর্য,গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সব কিছু  
 অবস্থান প্রথম আসমানের নীচে। আর সর্ব বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবহিত।

بِالْصَّوَابِ اعْلَمُوا لِلَّهِ

,

প্রমান্যগ্রন্থাবলীঃ

তাফসীরে তাবারী ২০/৫১৮ পৃষ্ঠা।

তাফসীরে ইবনে কাসীর ১৮/৫৯৯ পৃষ্ঠা।

তাফসীরে উসমানী ৬/২৫২ পৃষ্ঠা।

তাফসীরে জালালাইন ৫/৩৪২ পৃষ্ঠা।

তাফসীরে ফি-যিলালিল কুরআন ১৭/৯৭ পৃষ্ঠা।

বুখারী শরীফ ৫/৩৬২ পৃষ্ঠা।

ফাতহুল বারী ৮/৪০২ পৃষ্ঠা।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/৫৮ পৃষ্ঠা।

মুকাশাফাতুল কুলুব ১/২২৭ পৃষ্ঠা।

**\*সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী স্থির।\***

অতিসম্প্রতি একজন সৌদী গবেষক দাবী করেছেন পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। যদি পৃথিবী ঘুরত তাহলে বিমান কখনও তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারতো না। আসুন দেখি আসলে কি তাই।

প্রাচীন কালে প্লেটো, এরিস্টটল ও টলেমিদের সময় তাঁহার মত দিয়েছিলেন, পৃথিবী স্থির। এই পৃথিবীই হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র। একে কেন্দ্র করেই সূর্য চক্রাকারে ঘুরছে অবিরাম। টলেমি একটা বিখ্যাত বই লিখেন, যা জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী বইগুলোর একটি, নাম আলমাজেস্ট। এই বইয়ে এরিস্টার্কাসের বদলে এরিস্টটলের ভূকেন্দ্রিক মতবাদ পূর্ণতা পায়। টলেমির কারণে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র- এটা অনেকটা ধ্রুব সত্যে পরিণত হয়। খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসীরা প্লেটো, এরিস্টটল এবং টলেমির মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করে। এই তিনজন পরিণত হন খ্রিস্টান চার্চ শাসিত পশ্চিমা বিশ্বের তিন পথ প্রদর্শকে। এরপর ব্রুনো ও গ্যালিলিও চার হাজার বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠিত "বৈজ্ঞানিক থিউরীকে" বাতিল করে দিয়ে বললেন, পৃথিবী ভন ভন করে ঘুরে চলেছে সূর্যের চারপাশে। যেমন খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্ম সেসময় আহত হয়ে গ্যালিলিও ও ব্রুনোর উপর চড়াও হয়েছিল। যার ফলে ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল গ্যালিলিওকে সারা জীবন অন্তকার প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। কারণ তাওরাতের দাবী ছিল সূর্য

পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবং এই পৃথিবী স্থির।

কে কাকে কেন্দ্র করে ঘুরে সূর্য না পৃথিবী এই প্রশ্নে ইসলামী স্কলার, মাশায়াখ, আল্লামারা পরীক্ষার করে বলেছেন, কুরআন মতে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। এই ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রী ঘটে থাকে। উনারা জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের হাতে যে দলিলগুলো রয়েছে তার মাধ্যমে পৃথিবীর সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরার কোন প্রমাণ নেই...(ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম-আল্লামা উসাইমীন রাহ)।

এবার আমরা বিশিষ্ট আলেম ও স্কলারা যে দলিল দেখিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন পৃথিবী স্থির ও সূর্য তার চারপাশে ঘুরে তা উপস্থাপন করব। এ ক্ষেত্রে পন্ডিতবর্গেরা সূরা বাকারার ২৫৮ নম্বর আয়াতকে দেখিয়ে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বলে বুঝতে সক্ষম হন। সূরা বাকারায় বলা আছে, "আল্লাহ তাআ'লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।"

সূরা আনআ'ম এর ৭৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে – "অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেনঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত..."(সূরা আনআ'মঃ ৭৮)।

আলেমরা ও পন্ডিতরা এর ব্যাখ্যা করে বলেন, এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় পৃথিবী ঘুরছে না। পৃথিবী স্থির। যদি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরত তাহলে কুরআনে বলা হতো,



সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেলো। বার বার বলা হচ্ছে সূর্য ডুবে, সূর্য উঠে। তাই প্রমাণ হাজির সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে!

সূর্যের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরার আরো একটি প্রমাণ রয়েছে সূরা কাহাফে। এখানে বলা হয়েছে, “তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।” (সূরা কাহাফঃ ১৭)। আলেম ও পণ্ডিতরা এ বিষয়ে বলেছেন, পাশ কেটে ডান থেকে বামে চলে যাওয়ার কথা থেকে প্রমাণ হয় নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলত গুহা পাশ কেটে যায় সূর্য থেকে। একবারও বলা হয়নি পৃথিবী উদয় ও অস্ত যাচ্ছে, সূর্যকে বলা হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে!

“স্বীর পৃথিবীর” চারপাশে সূর্যের ঘুরার আরো একটি মোক্ষম প্রমাণ হাজির করা হয় সূরা যুমার থেকে। এখানে বলা হয়েছে- “তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত, জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।” (সূরা যুমারঃ ৫)। ইসলামী পণ্ডিত বলেন, এখানে চন্দ্র ও সূর্য যে চলমান আছে তার

পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। একবারও পৃথিবীকে দিবা-রাত্রী উপর ঘুরানোর কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে দিন-রাত্রীর কাজে সূর্য নিয়োজিত আছে। যদি সূর্য স্থির থাকত তাহলে পৃথিবীতে সব সময় দিনের আলো ফুটে থাকত। যেহেতু স্থির পৃথিবীর ধারণা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত (পৃথিবী ঘুরার প্রশ্নই আসে না কারণ তাহলে আমরা মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম!!) তাই এক্ষেত্রে সূর্য না ঘুরলে রাত-দিন কিভাবে হবে?

"শপথ সূর্যের ও তার কিরনের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে" [সুরা আশ-শামস: ১-২] এখানে বলা হয়েছে যে চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চারদিকে ঘুরত তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করতো না। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করতো। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এই আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থির থাকার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

হাদিসে বলা হয়েছে, "হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু

তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।” (সহি বুখারি, বই-৫৪, হাদিস-৪২১)।

উপরিউক্ত কোরআনের আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমানীত হয়, পৃথিবী স্থির বরং সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। কোরআনের কোথাও বলা হয়নি পৃথিবী ঘুরে।

### **পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে- সাংবাদিক সম্মেলনে সুশান্ত দেবের দাবী**

সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধিঃ পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। এমনই দাবি করলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার চুন্টা ইউনিয়নের চুন্টা গ্রামের সুশান্ত দেব (৪০) নামের এক ব্যক্তি। গত শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ দাবি করেন। পেশায় একজন টেইলার্স (দর্জি) হলেও বিশ্বের বিজ্ঞানীদের প্রচলিত মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের মতবাদের পক্ষে তিনি ছয়টি যুক্তি দাড়া করিয়েছেন।

সুশান্ত বলেন, ১৯৯০ সালে চুন্টা এসি একাডেমিতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে তিনি চুন্টা বাজারে টেইলারের কাজ করার পাশাপাশি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সৌরজগতের প্রচলিত তথ্য নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি প্রচলিত ধারণাটি ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর ধারণার পক্ষে তিনি ছয়টি যুক্তি তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে সুশান্ত দেব বলেন গবেষনার শুরুতে তিনি প্রথমে একটি ইটের টুকরা ওপরের দিকে ফেলেন। পৃথিবী ঘূর্ণনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী টুকরাটি তার কাছ থেকে ২.২০কি. মি. দূরে পড়ার হিসাব করলেও টুকরাটি তার কাছেই পড়েছে। সেই থেকে তিনি ধারণা করেন সূর্য নয় পৃথিবী স্থির। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সুশান্ত দেবের ছয়টি যুক্তি হলো

১। ঢাকা থেকে ৪২২০ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত কোনো স্থানে যেতে একটি বিমান যদি ঢাকা থেকে ঘন্টায় ৫০০কি. মি. বেগে যায় আর পৃথিবী যদি ঘন্টায় ১৬১০কি. মি. বেগে পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে ঘুরে তাহলে বিমানটি গন্তব্যে পৌঁছতে প্রচলিত ধারণায় সময় লাগবে দুই ঘন্টা। কিন্তু তার ধারণায় পৃথিবী স্থির বলে সময় লাগবে প্রায় ৮ঘন্টা ২৬মিনিট।

২। ঢাকা থেকে ৪২২০ কি. মি. পূর্ব দিকে অবস্থিত কোনো স্থানে যেতে একটি বিমান যদি ঢাকা থেকে ঘন্টায় ৫০০কি. মি. বেগে যায় আর পৃথিবী যদি ঘন্টায় ১৬১০ কি. মি.বেগে পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে ঘুরে তাহলে বিমানটি (১৬১০-৫০০) ঘন্টায় ১১১০ কি. মি. পূর্ব দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে সরে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটি না হওয়ায় এতে তিনি ধারণা করেন পৃথিবী স্থির।

৩। প্রচলিত ধারণামতে পৃথিবী যদি ঘন্টায় ১৬১০ কি. মি. বেগে নিরক্ষরেখায় নিজ অক্ষের ওপর ঘুরে তাহলে বিমানের কোনো গতির প্রয়োজন নেই। আকাশে এক জায়গায় বিমান দাড়িয়ে থাকলেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মাটিতে নামতে পারত।

৪। পৃথিবীর যদি গতি থাকে তাহলে যুক্তরাজ্য থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাগামী বিমান ব্রাজিল চলে আসবে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যুক্তরাজ্যগামী বিমান কানাডা চলে যাবে। এরকম হওয়ার কারণ পৃথিবীর আবর্তন গতি। আবর্তন গতি থাকলে বিমান দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে বা উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে কোনো দিনই তার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে পারবে না।

৫। পৃথিবী থেকে মানুষ মঙ্গল গ্রহে বা চাঁদে যায় রকেটের মাধ্যমে। রকেটের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৯ কি. মি.। পৃথিবীর পরিভ্রমণ গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কি. মি.। পৃথিবী থেকে মহাকাশের পথে যদি কোনো রকেট যাত্রা করে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে  $(৩০+৯) = ৩৯$  কি. মি., প্রতি মিনিটে ২৩৪০ কি. মি., আর প্রতি ঘন্টায় ১৪০৪০০ কি. মি. হিসাবে রকেটটি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে রকেটটি ফিরে আসা কোনো দিনই সম্ভব হবে না। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হচ্ছে না। তার ধারণায় এটা প্রমাণ করে পৃথিবী স্থির।

৬। রকেটটি যদি পৃথিবীর পরিভ্রমণ গতির সামনের দিক হতে যাত্রা করে তাহলে যাত্রা করার সাথে সাথে পৃথিবীর সাথে রকেটটি ধাক্কা লেগে মাটিতে পরে যাবে কারণ পৃথিবীর পরিভ্রমণ গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কি. মি. এবং রকেটের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৯ কি. মি.।

সুশান্ত দেব সংবাদ সম্মেলনে পৃথিবী ঘূর্ণনের তথ্যে বিজ্ঞানীদের প্রচলিত ধারণায় ভুল রয়েছে চ্যালেঞ্জ করে তা সংশোধনের দাবি করে বলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে নয় সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

আমার কথা: ইনি একজন অল্প শিক্ষিত এবং অমুসলিম হয়েও নিজের মগজটাকে প্রচলিত হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলোজির (সূর্যকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের) বিপরীতে খাটিয়েছেন . নাসার দেয়া তত্ত্বের উপরে প্রশ্ন তুলেছেন এবং চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত করেছেন . অথচ আমাদের মুসলিম ভাইদের কাছে স্পষ্ট আয়াত থাকার পরেও নাসার উপরে প্রশ্ন করার সাহস পায় না . বরং আমাদেরকে বাধা দিয়েই যাচ্ছেন . আফসোস ওই সমস্ত ভাইদের অন্য যারা এখনো নাসার ফাঁদ থেকে বের হতে পারেন নি . আপনারা বড়ই দুর্বল ও ভীতু মুমিন .

হে আল্লাহ আপনি এই সমস্ত ভাইদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুন .

### সূর্য কোথায় এবং কিভাবে, উদয় হয় এবং অস্ত যায়?

আল্লাহ বলেছেনঃ

অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। [ সূরা কা'হফ ১৮:৮৫ ]

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا  
قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَّخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا

অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পক্ষিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।

আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। [ সূরা কা'হফ ১৮:৮৬ ]

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا

অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। [ সূরা কা'হফ ১৮:৮৯ ]

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبِيلًا  
অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। [ সূরা কা'হফ ১৮:৯০ ]

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। [ সূরা কা'হফ ১৮:৯১ ]

”

ইমাম ইবন কাসির(র) আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে বলেনঃ যুল কারনাইন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। সেখানকার অধিবাসীরা ঘরবাড়ী তৈরি করত না, সেখানে কোন গাছপালা ছিল না, রোদের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেখানে কিছু বিদ্যমান ছিল না।

এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ(র) এর উক্তি এই যেঃ সেখানে কিছুই উৎপন্ন হত না। সূর্য উদিত হবার সময়ে তারা সুড়ঙ্গে চলে যেত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের জীবিকার অন্বেষনে দূরবর্তী ক্ষেত-খামারে ছড়িয়ে পড়ত। (তাবারী ১৮/১০০)

আবু যর (রা.) হতে বর্ণিতঃ একদা আমি সূর্যাস্তের সময় আল্লাহর নবীর পেছনে বসে গাধার পিঠে করে যাচ্ছিলাম। তখন আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি জানো সূর্য কোথায় অস্ত যায়?” আমি বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর নবীই ভালো জানেন।’ তখন তিনি বললেন, “এটি অস্ত যায় গরম পানির জলাশয়ে।”

এছাড়াও তাফসীরে ইবনে কাছীরের ফ্রিন শট গুলো ভালো করে দেখুন ও পড়ুন।

ইনশাআল্লাহ সূর্য কোথায় অস্ত যায় তা বুঝতে পারবেন।

৪৯৬

1 no page

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি **فِي عَيْنِ حَمَاءٍ**। গড়িতেন এবং উহার অর্থ করিতেন মাটি বিশিষ্ট পানির মধ্যে অস্ত যায়। একবার কা'ব আহবারকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা কুরআন সম্পর্কে অধিক বেশী জান কিন্তু আমি কিতাবের মধ্যে যাহা পাই তাহা হইল, সূর্য কালো মাটির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবু দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে দীনার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) তাহাকে **حُمَاءٍ** পড়াইয়াছেন।

আলী ইবনে আবু তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ** বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ গরম পানির মধ্যে সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিতে পাইলেন।



2 no page

হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন বিশুদ্ধ মত হইল উভয় কিরাতই মাশহুর ও সুপরিচিত কিরাত এবং ইহার যেইটিই কারী পড়িবে বিশুদ্ধ পড়িবে বলিয়াই ধরিতে হইবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, দুইটির কিরাতের অর্থে কোন বিরোধ নাই। কারণ সূর্যের অন্তকালে ঐ স্থানে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় সূর্যের কিরণ সরাসরি পানিকে স্পর্শ করিবার কারণে পানি গরম হইতে পারে এবং ঐ স্থানের মাটি কালো বর্ণের হইবার কারণে উহার পানিও ঐ একই বর্ণ ধারণ করিতে পারে। যেমন কা'ব আহবার ও অন্যান্য মনীষীগণ বলিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লা (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আওয়াম....আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার সূর্যাস্তের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, যদি আল্লামার নির্দেশে উহার দাহন হ্রাস করা না হইত তবে উহা পৃথিবীর সব কিছুকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিত। ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহার মারফু' হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে। সম্ভবত, ইহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-এর বক্তব্য। এবং ইহা তিনি সেই দুইটি থলে হইতে লইয়াছেন যাহা তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে পাইয়াছিলেন। وَاللَّهِ أَعْلَمُ

3

ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন হাজ্জাজ ইবন হামজা (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত মু'আবীয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ পড়িলেন তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

---

### Contents

সূরা আল-কাহাফ

৪৯৭

বলিলেন, আমরা তো ইহাকে عَيْنِ حَمِيَّةٍ পড়ি। অতঃপর হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আয়াতটি কি রকম পড়েন? তিনি বলিলেন, যেমন আপনি পড়েন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কে বলিলাম, আমার ঘরেই তো কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব ইবনে আহবার-এর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য কোথায় অস্ত যায়

4

আহবার-এর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য কোথায় অস্ত যায় তাওরাতে এই সম্পর্কে কি উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, কোন আরবকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা এই বিষয়ে অধিক ভাল জানে। তবে সূর্য কোথায় অস্ত যায় এই সম্পর্কে আমি তাওরাতে যাহা পাইয়াছি তাহা হইল সূর্য পানি ও মাটি অর্থাৎ কাদার মধ্যে অস্ত যায়। এই কথা বলিয়া তিনি পশ্চিম দিকে ইংগিত করিলেন। ইবনে হাযের এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকিতাম তবে আপনার সমর্থনে 'তুব্বা'র এই কবিতা দুইটি পড়িয়া শুনাইতাম। যাহাতে তিনি যুলকারনাইন-এর আলোচনা করিয়াছেন।

بَلَغَ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ + أَسْبَابُ أُمْرٍ حَكِيمٍ مُرْشِدٍ  
فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا + فَمِنْ عَيْنٍ ذِي خُلْبٍ وَثَاطُ حُرْمَدٍ

অর্থাৎ যুলকারনাইন মাসরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়াছিলেন কারণ মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাহাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের সময় উহাকে কাল মাটির ন্যায় কাদার মধ্যে অস্ত যাইতে দেখিলেন।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন কবিতার মধ্যে উল্লেখিত الْخُلْبُ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, الْخُلْبُ অর্থ মাটি الْثَاطُ অর্থ, কাদা ও الْحُرْمَدُ অর্থ কালো। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন এই লোকটি যাহা বলেন, তুমি উহা লিখিয়া রাখ।

- 5

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরা কাহাফের এই আয়াত **وَجَدَهَا تُغْرِبُ فِي حَمِيَّةٍ** পাঠ করিলেন। তখন কা'ব উহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন সেই সত্তার কসম যাহার হাতে কা'বের প্রাণ তাওরাতে এই বিষয়টি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুরূপ এই আয়াতকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতিত অন্য কাহাকেও পাঠ করিতে শুনি নাই। তাওরাতে আমি এই বিষয়টি এইরূপ পাইয়াছি, “সূর্য কালো কাদার মধ্যে অস্ত যায়”। আবু ইয়াল মুসেলী বলেন, ইসহাক ইবনে ইসরাঈল হিশাম ইবনে ইউসুফ-এর সূত্রে “ তাফসীরে ইবনে জুরাইজ” এর মধ্যে **وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যেই খানে সূর্য অস্ত যায় তাহার নিকটবর্তী একটি শহর ছিল যাহার বার হাজার দরজা ছিল যদি শহরবাসীর

ইবন কাছীর—৬৩ (৬ষ্ঠ)

### Contents

৪৯৮

তাফসীরে ইবনে কাছীর

শব্দ না হইত তবে সূর্যাস্তকালে তাহারা সূর্যাস্তের শব্দগুলিতে পাইত। **وَجَدَ عِنْدَهَا**

**পৃথিবী সমতল হলে দিনের বেলা আমরা কেন সূর্যকে দেখতে পাই না।**



আল্লাহতালা দিবসের অধিপতি করেছেন সূর্যকে। আর চাঁদের জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মঞ্জিল।

বিকেলের একবারে শেষ দিকে এবং সকালের একবার শুরুর দিকে চাঁদকে চাদের কলা অনুপাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে দেখা যায়। আপনি চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন।

সমতল পৃথিবী সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত এরকম যে, পাহাড়-পর্বত উঁচু-নিচু সব মিলিয়ে পৃথিবীর বিস্তৃত সমতলা একেবারে প্লেইন সমতল নয়।  
অপরদিকে চাঁদ সূর্য পৃথিবীর তুলনায় আকারে অনেক ছোট। সেগুলোকে যত উপরে বলা হয় ততো উপরে নয়।

তাহলে আপনি দিবসে কেন সূর্যকে দেখতে পান না তার তিনটি কারণ আছে।

১/দিবস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সাবজেক্ট হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে সূর্যকে দিবসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই দিনের বেলায় আপনি সূর্যকে দেখতে পান, রাতে নয়।

২/সূর্য পৃথিবীর তুলনায় অনেক ছোট এবং নিচে থাকার কারণে মেঘমালা এবং জলবায়ু সূর্যকে আড়াল করে দেয়। জল বায়ুর ঘনত্ব ভেদ করে অনেক দূরে দেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র সূর্যের আলো আপনি যে ভূমিতে আছেন, সে পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না।

৩/সর্বশেষ কারণটি হলো জমিন একেবারে প্লেইন সমতল নয়। উঁচু-নিচু এবং পাহাড়-পর্বত দিয়ে পৃথিবীতে বিস্তৃত করা হয়েছে। আপনি যে ভূমিতে অবস্থান করছেন ঠিক সে ভূমি থেকে সূর্য যত দূরে যেতে থাকে ততই সেটা আড়াল হতে থাকে। একসময় সেটা দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। এমনটা আপনি সূর্য অস্ত যাওয়ার

সময় বর্তমানে অর্থাৎ শীতকালীন সময় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখতে পাবেন। সমুদ্রতীরে গৃষ্ম কালীন সময়ে দেখা যায় সূর্য পানির নিচে যেন অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু শীতকালের দিকে দেখা যায় সূর্য পানিতে অস্ত যাওয়ার বহুপূর্বে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। সূর্য চলে যাওয়ার পরেও তার আলো তখনোও বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আলোটাও চলে যায়। আপনি ঠিক সূর্য উদয়ের আগেও দেখতে পাবেন সূর্য প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সূর্যের আলো প্রকাশিত হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে সূর্য প্রকাশিত হয়।

যদি পৃথিবী গোল হত তাহলে এমনটা হতো না। তার উদাহরণ নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড।

ঠিক এই সিজনে ওই অঞ্চলে ১৮ ঘন্টার অধিক সময় রাত্র থাকে। তার ঠিক বিপরীত সিজনে অনুরূপ সময় দিন থাকে তখন সূর্য আড়াল হয় না।

গোল পৃথিবী হলে তো এমনটা হওয়া সম্ভব ছিলনা।

আবার এইসব অঞ্চলে (নরওয়ে, অল্যান্ডা, সুইডেন, ইত্যাদি) রাতের বেলাতেও সূর্য দেখা যায়।



দিনের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে সূর্যকে সূর্য উদয় ও অস্ত কালীন সময়ের তুলনায় ছোট দেখা যায়।

সূর্য পৃথিবীর একেবারে নিকটেও না আবার একেবারে উপরেও না।

সূর্যের জন্য আছে 12 টি রাশিচক্র। সে অনুসারে সিজন অনুযায়ী সূর্যের দূরত্ব কম এবং বেশি হয়ে থাকে।

চাঁদ এবং সূর্যের জমিনের থেকে উপরের দিকে দূরত্বের পরিমাণ চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার হাদীসটি পড়লে অনেকটা অনুমান করে নিতে পারবেন।

যেখানে বলা হয়েছিল চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার পর দুটি পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়। তখন ওই অঞ্চলের অনেকেই চাঁদকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখতে পায়নি। দেখে থাকলেও সেটা খণ্ডিত অংশটুকুই দেখেছে যার যার দূরত্ব থেকে। সেই অনুপাতে সূর্যের দূরত্ব টাও এরকমই।

**যারা পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্যের আবর্তনকে অবিশ্বাস করে তাদের ব্যাপারে আরব শায়েখদের বক্তব্য:**

পাঁচজন শায়েখের স্পষ্ট বক্তব্য এখানে দেয়া আছে। উনারা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, সূর্যই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তিত হচ্ছে। উনারা এটাও বলেছেন যে, " সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণাটা নাস্তিকদের, মুমিনদের নয়। আর এটা কোরানের উপর মিথ্যাচার। " এবং তারা এই ধারণাকে কুফর পর্যন্ত বলেছেন। এবার আগ্রহী পাঠকগণ সরাসরি নিচের লিংকগুলো থেকে পড়ে নিন। এবং নিজের আকিদাকে বিশুদ্ধ করে নিন।



## Disbelief of the One Who Denies Sun's Motion Around th

Filed under: [Articles](#)

Saturday, March 14 2020 - by [Abu.Iyaad](#)

There does not cease to remain those who have passed through the institutions, acquiring the conjectures and speculations of the sciences of the disbelievers and believing them to be truth whilst describing what the Qur'an and Sunnah have come with as being "ideas" which opposed realities. Such statements are statements of kufr uttered by ignoramuses. **Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz bin Bāz** (رحمہ اللہ) said that the Sun is stationary, not moving [in orbit] has belied Allāh and has belied His Noble Book which cannot be approached by falsehood from in front or behind, a revelation from an all-wise, praiseworthy one... Everyone who uttered this statement has uttered disbelief and misguidance because it is a denial of Allāh's [truthfulness], a denial of the Qurʾān, and also a denial of the Messenger (مَلْسُو هِيَ لَعَلَّاهُ يَلْصُقُ)..."

For detailed evidences from **Shaykh al-Tuwayjurī** (رحمہ اللہ), refer to the article at <http://aboutatheism.net/?wzovydv>

You will also find this more detailed and technical article very helpful: "**Keeping a Stationary Earth**

**Moving Through Imaginary Physics and Propping Up the Cosmic Religion of Giordano Bruno" at <http://aboutatheism.net/?oqcvywc>.**

---

**Statement of Shaykh Ibn Baz: [Read PDF](#)**

**Statement of Shaykh Ubayd al-Jabiri: [Read PDF](#)**

**Statement of Shaykh Muqbil bin Hadi: [Read PDF](#)**

**Statement of Shaykh Ibn Baz: [Read PDF](#)**

**Statement of Shaykh Ibn Uthaymin: [Read PDF](#)**

**Statement of Shaykh Hamud al-Tuwayjuri: [Read PDF](#)**

Link: <http://www.aqidah.com/creed/articles/auazc-disbelief-of-the-one-who-denies-suns-motion-around-the-earth.cfm?fbclid=IwAR2uP0ulqK3ZKKVJpB6eOi5h-r3Qlbox5BXyYxZu4erNOnfFUnuGsYPogzK8>

পিডিএফ লিংকগুলো, টাইটেল সহ আলাদা করে আমি দিয়ে দিলাম।

- (1) Takfīr of the One Who Denies Night and Day are Through the Actual Motion of the Sun Around the Stationary Earth

<http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/bini-baz-takfir-sun-earth.pdf>



- (2) The Statement of He Who Denies Night and Day are Through the Actual Motion of the Sun Around the Stationary Earth is Kufr

<http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/ubayd-jabiri-earth-sun.pdf>

- (3) Shaykh Muqbil: Speaking with the Motion of the Earth is Closer to Kufr

<http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/muqbil-earth-sun.pdf>

- (4) Shaykh Ibn Bāz: Regarding Takfīr of the One Who Speaks of Earth's Motion

<http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/bin-baz-earth-motion.pdf>

- (5) Shaykh Ibn ʿUthaymīn on the Night, Day, Months and Seasons

<http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/ibn-uthaymin-day-night-seasons.pdf>

(6) Shaykh Ḥamūd al-Tuwayjurī on the Motions of the Sun and Moon—Not Rejected Except By an Arrogant Denier, One Devoid of Intellect [or a Simpleton]

<http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/tuwayjuri-earth-sun.pdf>

পড়েছেন?

এর পরেও যারা বলবে, পৃথিবী ঘুরছে তাদেরকে আর কিছুই বলার নেই। তাদেরকে তাদের কল্পনা নিয়েই থাকতে দিতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি তত্ত্বের সঠিক বুঝ দান করুন, আমিন।

ব্রিলিয়ান্টরা ঠিকই লিংকগুলোতে ঢুকেছে।

আর যারা অলস। অর্থাৎ লিংকে ঢুকে পড়তে চাননা। তারা স্ক্রিন শটগুলো পড়ুন।

# Shaykh Ibn Bāz: Regarding Takfīr of the One Who Speaks of Earth's Motion



Shaykh ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz (رَحْمَةُ اللَّهِ) said: “

“As for the one who said that the Earth [moves] in orbit and the Sun also moves, his saying is lighter than the one who speaks with the stationary Sun. However, this in itself is a clear error and opposes the preceding verses, sensory perception and outward reality. It is an avenue to the saying that the Sun does not move. Allāh has already made clear in the aforementioned verses that He placed the mountains in the Earth so that it does not move with them and [the word] *mayd* means movement (*ḥarakah*), shaking (*iḍṭirāb*) and motion (*dawrān*) as the scholars of exegesis and imāms of the [Arabic] language have textually stated. In the takfīr of the one who speaks

# Shaykh Ibn ‘Uthaymīn on the Night, Day, Months and Seasons



**Shaykh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn (رَحِمَهُ اللهُ)** said, in explanation of the phenomena of night, day, months and seasons:

“The alternation of the day and night is due to the Sun’s orbit around the Earth. Allāh subjected the Sun and the Moon for us, making them persistent [in their courses] and as two signs amongst the signs of Allāh indicating the perfection in His power and vastness in His mercy. Since Allāh the Exalted created them they both traverse in their orbits in accordance with the command of Allāh. They do not raise above, fall below or deviate to the right or left [from their orbits]. He determined phases for them [in their orbits] that you may count the years and measurement [of time].

## চলমান সূর্যের গতি রোধ করার তিনটি ঘটনা:

### ঘটনা-১ (ইউশা বিন নুন):

সময় গণনার মাধ্যম সূর্যকে থামিয়ে দিয়ে সময়ের গতি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউশা ইবনে নুন (আ.)-এর সময়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘... তারা অভিযান পরিচালনা করল, তারা আসরের সময় বা তার নিকটবর্তী সময়ের জনপদের নিকটবর্তী হলো। তিনি (ইউশা ইবনে নুন) সূর্যের উদ্দেশে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি আদিষ্ট এবং আমি আদিষ্ট। হে আল্লাহ! আপনি একে (সূর্য) আমাদের ওপর স্থির রাখুন। তাকে স্থির রাখা হলো যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেছিলেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১২৪)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘মানুষের ওপর সূর্যকে কখনো স্থির রাখা হয়নি, তবে ইউশা (আ.)-এর জন্য রাখা হয়। যে রাতে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে সফর করেন।’ (ইবনুল কায়্যিম জাওজি, ফাদায়িলুল কুদস, পৃষ্ঠা. ১১৩)

### সূর্যের গতি থেমে যাওয়ার ঘটনা

মুসা ইবনে নুন ইব্রাহিম ইবনে ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আ হযরত মুসা আঃ এর পরবর্তী একজন নবী। তিনি তীহ ময়দানে থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে বের করে আনেন এবং যুদ্ধ ও অবরোধের পরে তাদেরকে নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। বিজয় যখন আসন্ন তখন সময় ছিল শুক্রবার আসরের শেষ সময়। একটু পরেই সূর্য ডুবে গেলে শনিবার এসে পড়বে এবং তখন আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না কারণ শনিবারে যুদ্ধ করা তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল। তিনি সূর্যের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে সূর্য, তুমি আল্লাহর

আদেশক্রমে অগ্রসর হচ্ছে, আর আমিও আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছি। তারপর বললেন, হে আল্লাহ, আমার জন্য সূর্যকে থামিয়ে দিন। সূর্য কে আটকে রাখুন। সুতরাং আল্লাহ সূর্যকে আটকে রাখেন এবং শহর পূর্ণভাবে জয় হওয়ার পর তা অস্ত যায়। মুসলিম শরীফ এই আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, অতীতকালে একজন নবী একটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আসর নামাজ পড়ার পরেই বা তার কাছাকাছি সময়ে তিনি শহরের নিকটবর্তী হয়ে যান। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সূর্য, আল্লাহ হুকুম পালন করছে, আমিও আল্লাহর নির্দেশ পালন করছি। হে আল্লাহ, একে তুমি আমার জন্য কিছুক্ষণ আটকে রাখো। সুতরাং আল্লাহ সূর্যকে আটকে রাখেন এবং তিনি শহর দখল করে নেন। এই নবী হলেন ইউশা ইবনে নুন। ইমাম আহমেদ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, কোন মানুষের খাতিরে সূর্যকে আটক রাখা হয়নি, কেবলমাত্র ইউশা ইবনে নুন এর ব্যতিক্রম। তিনি যখন বাইতুল মোকাদ্দাসে অভিযানে যান তখন সূর্যকে অস্ত যেতে দেয়া হয়নি।



### ঘটনা-২ (আলী রা:):

একদা রাসূলুল্লাহ সা এর উপর ওহী আসছিল। তখন তার শির মোবারক ছিল হযরত আলী রাঃ এর কোলো সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর মাথা উঠালেন না। এদিকে আলী রাঃ ও আসরের সালাত আদায় করেননি। রাসূলুল্লাহ সা তখন আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। হে আল্লাহ, সে তো আপনার আনুগত্য ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করছিল। সুতরাং সূর্যকে কিছুটা পশ্চাতে নির্ধারিত করে দিন। আল্লাহ তাই করলেন। সূর্যকে প্রত্যাবর্তন করে দিলেন। হযরত আলী আসরের সালাত আদায় করার পর সূর্য অস্ত গেল।

### ঘটনা-৩ (রাসূলুল্লাহ সা):

ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ সা এর ইসরা রজনীর প্রত্যুষে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সা ইশরাক রজনীর পরবর্তী সকালের দিকে ঘটনা শোনালেন এবং বললেন, এ রাতে আমি মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করে এসেছি। কুরাইশরা বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করল। তখন আল্লাহ তাআলা রাসূলকে বায়তুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করে দেন এবং তা দেখে দেখে তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। এরপর কুরাইশরা তাদের এক বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যারা সিরিয়া থেকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সা জানালেন সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই তারা মক্কায় পৌঁছে যাবে কিন্তু পথে কাফেলার কোন কারণে দেরি হওয়ায় আসতে বিলম্ব হয়। আল্লাহ তা'আলা তখন সূর্যের গতি রোধ করে দেন এবং আসরের সময় তারা মক্কায় পৌঁছে যায়। এই ঘটনা তার 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত আলীর জন্য সূর্য আটক হওয়ার বর্ণনা করেছেন আসমা বিনতে

আবু হুরায়রা ও স্বয়ং হযরত আলী।

সূত্র: আল্লামা ইবনে কাসীর প্রণীত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব ষষ্ঠ খন্ড 418 পৃষ্ঠা

RM: উপরোক্ত তিনটি ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে সূর্য গতিশীল এবং পৃথিবী স্থির। অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য আবর্তিত হচ্ছে। আর এটাই বাস্তব সম্মত, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি সঙ্গত।

**আল কুরআনে “দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম” সংক্রান্ত তথ্য:**

আল্লাহ তা’আলা আল কুরআনে বলেনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِ

অর্থঃ “তিনি দুই ‘মাশরিক’ ও দুই ‘মাগরিব’ এর প্রভু”

(আল কুরআন, আর রহমান ৫৫ : ১৭)

এখানে ‘মাশরিক’ কী? ‘মাগরিব’ কী?

ডিকশনারি খুললে ‘মাশরিক’, ‘মাগরিব’ এই শব্দগুলোর অর্থ আপনি পাবেন - পূর্ব, পশ্চিমা এখন এর উপর ভিত্তি করে যদি চট করে আপনি বলে দেন, “কুরআনের মত অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। কারণ পৃথিবীর দুইটা পূর্ব দিক এবং দুইটা পশ্চিম দিক থাকা কীভাবে সম্ভব?” - তাহলে সেটি খুবই তাড়াহুড়ো করা মনোভাবের পরিচায়ক হবো। এটা সাধারণত নাস্তিকদের পয়েন্ট অফ ভিউ।

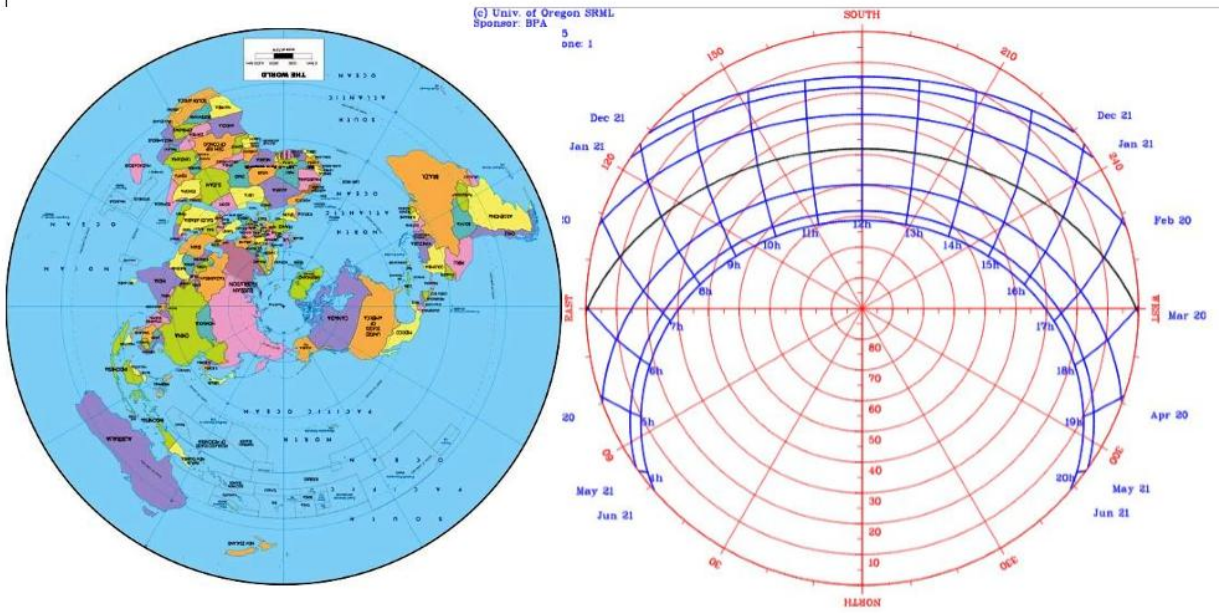


এখন অন্য ইন্টারপ্রিটেশন (ব্যাখ্যা) খেয়াল করা যাক। আরবিতে ‘শারাক্বা’ অর্থ আলোকজ্জ্বল হওয়া এবং ‘গারাবা’ অর্থ ডুবে যাওয়া। ‘মাশরিক’ অর্থ আলোকজ্জ্বল হবার স্থান এবং মাগরিব অর্থ ডুবে যাওয়ার স্থান, যেভাবে ‘সাজাদা’ অর্থ সেজদা করা, আর ‘মাসজিদ’ অর্থ সেজদা করার স্থান; ‘জালাসা’ অর্থ বসা, আর ‘মাজলিস’ অর্থ বসার জায়গা। সূর্য যেহেতু পূর্বদিকে আলোকজ্জ্বল হয়ে উদ্ভিত হয় তাই পূর্বকে আরবিতে ‘মাশরিক’ বলে, আর পশ্চিমে গিয়ে অস্তমিত হয়, তাই পশ্চিমকে ‘মাগরিব’ বলে।

অর্থাৎ মাগরিব/মাশরিকের মূল অর্থ পূর্ব বা পশ্চিম নয়। বরং সূর্যের অস্তাচল ও উদয়াচল আকাশে উদ্ভিত ও অস্তমিত হবার জায়গা।

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেন শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে। বছরের প্রত্যেক দিনই সূর্য আকাশে ভিন্ন ভিন্ন কোণ (angle) তৈরি করে উদ্ভিত ও অস্তমিত হয়। গ্রীষ্ম ও শীতে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলের কোণে (angle) সবচেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যায়। আয়াতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বছর জুড়ে সূর্যের গতিপথ কেমন হয় তা নিচের ফিগারে দেখে নিতে পারেন।

চিত্রে লাল বৃত্ত দিয়ে কোণ (angle) নির্দেশ করা হচ্ছে। সবার বাইরের বৃত্তে ডিগ্রীতে কোণের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর নীল রেখাগুলো হচ্ছে সূর্যের সারাদিনের গতিপথ। নীল দাগগুলোর উপর লম্বা লম্বা ছোট কিছু দাগ রয়েছে। এগুলো দিনের বিভিন্ন ঘণ্টা নির্দেশ করে। বছরের ৬টি দিনে সূর্যের গতিপথ দেখানো হয়েছে। সবার নিচেরটি জুন ২১ এর, আরে সবার উপরেরটি ডিসেম্বর ২১ এর। আর এই পর্যবেক্ষণটি রটারডাম নামক স্থান থেকে গৃহীত। খেয়াল করুন:



- জুনের ২১ তারিখ সেখানে ভোর ৪টায় সূর্য উত্তর থেকে ৫০ ডিগ্রী কোণ করে, অর্থাৎ ঠিক পূর্ব থেকে উত্তরে ৪০ ডিগ্রী কোণ থেকে উদিত হয়েছে।
- ডিসেম্বরের ২১ তারিখ সেখানে সূর্য উদিত হয়েছে সকাল সোয়া ৮টায়। এবার সূর্য উদিত হয়েছে ঠিক পূর্ব থেকে দক্ষিণে ৪০ ডিগ্রী কোণ করে।
- অর্থাৎ ৬ মাসে সূর্যের উদয়স্থল বা উদয়াচলের পার্থক্য হচ্ছে ৮০ ডিগ্রী।
- একইভাবে অস্তাচলের ক্ষেত্রে জুন ২১ ও ডিসেম্বরের ২১ এ ৮০ ডিগ্রী পার্থক্য আছে।

এটাই কুরআনে উল্লিখিত দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের ব্যাখ্যা। উদয়াচল ও অস্তাচল প্রতিদিনই ভিন্ন হয়। কিন্তু গ্রীষ্ম ও শীতে এর পরিবর্তন ভাল করে বোঝা যায়। তাই দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহজে উপলব্ধির জন্য আয়াতে এই দুই ঋতুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

### **সূরা রহমানে ২টি পূর্ব( উদয়াচল) ২টি পশ্চিম( অস্তাচল) বলার রহস্য:**

চাঁদ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ২৭ বার আলোচনা হয়েছে, একবার ভেবে দেখুন কি বিস্ময়কর মিল, এই সংখ্যাটি পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ একবার ঘুরে আসতে ব্যয়িত দিন সংখ্যার সমান। বৈজ্ঞানিকরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটাই প্রমাণ পেয়েছে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ঠিক ২৭ দিন, কিন্তু আমরা যেসব মানুষের তৈরী দিন পঞ্জিকার হিসাব মতে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৯.৫দিন। কিন্তু কুরআনের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে ২৭দিন, আর কুরআনের তথ্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সূরা রহমানের একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ২টি পূর্ব বা উদয়াচল এবং ২টি পশ্চিম বা অস্তাচলের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন (রাব্বুল মাশরিকাইনে ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন)

المَغْرِبِينَ وَرَبُّ الْمَشْرِقِينَ رَبُّ

তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। [ [সূরা আর-রহমান ৫৫:১৭](#) ]

আপনারা জানেন আরবীতে দ্বিবচন ব্যবহারের বিধান আছে, এখানে পূর্ব পশ্চিম ২টি শব্দকে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়। আমরা জানি সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয় পশ্চিম দিকে অস্ত যায় সে হিসেবে সূর্যের উদয়স্থান ১টি অস্ত যাওয়ার স্থানও ১টি কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কি কারনে দ্বিবচন ব্যবহার করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা কোন কিছুই হেকমত থেকে খালি নয়, তাই এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এখনো হচ্ছে। গবেষক গন ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন সূর্য যদিও পূর্ব দিকে উদিত হয়,

পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু প্রতিদিন এই একই সূর্য ঠিক একই স্থান থেকে উদিত হয়না প্রতিদিনই সূর্যের উদয়স্থল ও অস্ত যাওয়ার স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তবে বছরে শুধু একদিন এমন আছে যেদিন সূর্য পূর্বদিক থেকে সয়েবচেয়ে বেশী ব্যবধানে উদিত হয়। এবং বছরে একদিন পশ্চিম দিকে সবচেয়ে বেশী ব্যবধানে অস্ত যায়।

এছাড়া ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সব স্থানে দিন রাত সমান হয়। সেদিনে দিন হয় ১২ ঘন্টার রাত হয় ১২ ঘন্টার। এই দিনে সূর্য বিষুবরেখা বরাবর অবস্থান করে। এতে বুঝা যায় বছরে মাত্র ২ দিন সূর্য একই স্থান থেকে উদয় হয় অস্ত যায়।

এছাড়া শীত কালে সূর্য আমাদের থেকে দূর অবস্থান করে এবং আমাদের ছায়াও লম্বা হয় অপরদিকে গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে থাকে তাতে আমাদের ছায়া ছোট হয়, মূলত এভাবে প্রতিনিয়ত সূর্যের ডাইরেকশন পরিবর্তন হতেই থাকে। এই যে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সূর্যের উদয়স্থল ও অস্ত যাওয়ার স্থান ভিন্ন ভিন্ন হয় সেটির উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তায়ালা ২টি উদয়স্থল এবং ২টি অস্ত যাওয়ার স্থল বলে কোরানে বয়ান করেছে। সুবহানাল্লাহ।

আবার প্রতিনিয়ত যেহেতু একটু একটু করে সূর্যের উদয়স্থল ও অস্ত যাওয়ার স্থান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে সে জন্য হয়ত অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন শীত গ্রীষ্ম ২ কালে ২ স্থান থেকে সূর্য উদয় ও অস্ত যায় তাই সুরা রহমানে দ্বিবচন ব্যবহার হয়েছে কিন্তু সারা বছর খেয়াল করলে দেখা যায় সূর্য অসংখ্য স্থান হতে উদয় ও অস্ত যায় সে প্রশ্নের জবাব আমরা কুরআনের সুরা মায়ারিজ এর ৪০নং আয়াতে জানতে পারি যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

لَقَادِرُونَ إِنَّا غَارِبُونَ الْمَشَارِقِ بِرَبِّ أَقْسِمُ فَلَا

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম!

[ [সূরা মা'যারিজ ৭০:৪০](#) ]

এখানে দেখুন আল্লাহ তায়ালা উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের শপথ করছেন এতে বহুবচন ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা সে সন্দেহও দূর করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ

মোট কথা শীত ও গ্রীষ্ম কালে বড় ব্যবধানে সূর্য উদিত ও অস্ত যায়, তাই সূরা রহমানে আল্লাহ দ্বিবচন ব্যবহার করেছেন, আর প্রতিদিন সূর্য ছোট ছোট ভিন্নতা অবলম্বন করে উদিত ও অস্ত যায় তাই সূরা মা'যারিজে আল্লাহ উদয় ও অস্ত যাওয়ার স্থান বহুবচন ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানবানদের জন্য এই কুরআনে অনেক নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আজ মুসলমানরা কুরআনকে শুধু মৃত মানুষের রুহে সাওয়াব পৌঁছানো, গলায় তাবিজ বানিয়ে জিনের আছর থেকে রক্ষা পাওয়া, আয়াতুল কুরসি পড়ে রাতে চোর থেকে হেফাজতে থাকা এসব ছাড়া অন্য কোনভাবেই এ কুরআন থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করছে না।

আসুন আমরা কুরআন নিয়ে গবেষণা করি কুরআনের আলোকে নিজের জীবন তথা গোটা বিশ্বকে সাজাই এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অফুরন্ত কল্যান হাসিল করি।

**সূর্য কি চক্রাকারে ঘুরছে, নাকি দিন শেষে ডুবে যাচ্ছে?**

সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

(رَبِّ الْمَعْمَرِ مِنْ بِهَا فَاتِ الْمَشْرِقِ مِنَ الشَّمْسِ يَأْتِي اللَّهُ فَإِنَّ)

"আল্লাহ তাআ'লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে

উদিত কর।"

(সূরা বাকারাঃ ২৫৮) সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

২) আল্লাহ বলেনঃ

إِنِّي يَأْقُومُ قَالَ لَتَأْفُ قَلَمًا أَكْبَرُ اهْذَرْبِي هَذَا قَالَ بَارِغَةَ الشَّمْسِ رَأَى قَلَمًا  
تُشْرِكُونَ مِمَّا بَرِيءُ

"অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেনঃ এটি

আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে

আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।"

(সূরা আনআ'মঃ ৭৮) এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

একথা বলা হয়নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে

অবশ্যই তা বলা হত।

৩) আল্লাহ বলেনঃ

غَرَبَتْ وَإِذَا نَالِ يَمِينٍ دَاتَ كَهْفِهِمْ عَنْ تَنْزَاوَرُ طَلَعَتْ إِذَا الشَّمْسُ وَتَرَى  
(الشَّمَالِ دَاتَ تَقْرُضُهُمْ)

"তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।"  
(সূরা কাহাফঃ ১৭) পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে

যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদিনড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

৪) আল্লাহ বলেনঃ

يَسْبَحُونَ فَلَكَ فِي كُلِّ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسُ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ)

"এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-

সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে।”

(সূরা আমবীয়াঃ ৩৩)

ইবনে আব্বাস বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্য ও তেমনিভাবে ঘুরে।



৫) আল্লাহ বলেনঃ

(حَثِيثًا يَطْلُبُهُ النَّهَارَ اللَّيْلَ يُعْشِي)

“তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে।”

(সূরা আ'রাফঃ ৫৪) আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে,

দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।





৬) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُّ هَارًا عَلَى اللَّيْلِ يُكْوَرُّ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ)  
(الْغَفَّارُ الْعَزِيزُ هُوَ أَلَمْ يُسَمِّ لَأَجَلٍ جَرِي كُلُّ وَالْقَمَرِ الشَّمْسِ وَسَخَّرَ اللَّيْلَ

অর্থঃ “তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতিকে দিবস

দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও

চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত।

জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমামণী।”

(সূরা যুমারঃ ৫) আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর উপরে দিবা

-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-

রাত্রির উপর পৃথিবীকে ঘুরান। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান"। এই সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এ কথা

সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভূত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী

বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭) আল্লাহ বলেনঃ

(تَلَّاهَا إِذَا وَالْقَمَرِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ)

"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।"

(সূরা আশ্-শামসঃ ১-

২) এখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চার দিকে ঘুরত, তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করতনা। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে, আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এই

আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থির থাকার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-  
ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَنَازِلَ قَدَرْنَاهُ وَالْقَمَرَ, لِيَمِيعَ الْعَزِيزُ تَقْدِيرُ ذَلِكَ لَهَا لِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِي وَالشَّمْسُ  
الَّيْلُ وَلَا الْقَمَرَ ذُرْكَدُ أَنْ لَهَا يَنْبَغِي الشَّمْسُ لَا, الْقَدِيمَ كَالْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّى  
(يَسْبَحُونَ فَلَاكَ فِي وَكُلُّ النَّهَارِ سَابِقُ

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ  
। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর  
শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের

পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে

পরিভ্রমণ করে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮-

৪০) সূর্যের চলা এবং এই চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা

করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এই চলাচলের কারণেই  
দিবা-

রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মনযিল নির্ধারণ করার অর্থ এই যে, সে  
তার মনযিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মনযিল

নির্ধারণ করা হত। চন্দের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যরকে বলেছেনঃ

تَحْتَ تَسْجُدَ حَتَّى بُدْهَتْ فَإِنَّهَا قَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ قُلْتُ تَذْهَبُ أَيْنَ أَتَدْرِي  
ذَنْ يُؤْ قُلَّا وَتَسْتَأْذِنَ مِنْهَا قَبْلَ قُلَّا تَسْجُدَ أَنْ وَيُوشِكُ لَهَا فَيُؤْذَنُ فَتَسْتَأْذِنُ الْعَرْشِ  
مَغْرِبَهَا مِنْ فَتَطْلُعُ حَيْثُ حَيْثُ مِنْ أَرْجَعِي لَهَا يُقَالُ لَهَا

"হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার

বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে

পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়

। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না

। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য

পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।" এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে। আল্লাহ

সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম

দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এই ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এই কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়।

হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-

প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এই মুহূর্তে মনে আসছেনা। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এই বিষয়টির দ্বার উন্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!

**গ্রন্থঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম\***

**\*অধ্যায়ঃ ঈমান\***

R:M:

প্রচলিত ফ্লাট আর্থারদের মডেলে সূর্যকে চক্রাকারে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক

আরবরাও এমনটা মনে করে। আর এক্ষেত্রে এটাই (ইবনে আব্বাস রা: এর বক্তব্যটি ) সম্ভবত একমাত্র

দলিল।

(ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে

থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে)।

এই বক্তব্যটি ছাড়া উপরোক্ত পুরো আলোচনাই পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদয় হয়ে,

পশ্চিমে অস্ত যাওয়াকেই ইঙ্গিত করে।

8002

বাংলা/العربية

English

### 🗨️ পরিচ্ছেদঃ কুরআনের কিরআত ও পাঠের নিয়ম

8002। আবু যার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ “এটা উম্ম পানির এক বার্ণায় অস্তমিত হয়” (সূরা কাহফঃ ৮৬)।[1]

সনদ সহীহ।

أَنَّ اللَّهَ بَنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ  
وَنَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ،  
بِمَ التَّيْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ،  
لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى جِمَارٍ،  
تَذَرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ؟ قُلْتُ اللَّهُ  
عَيْنَ حَامِيَّةٍ

[1]. আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেনঃ সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

☀️ হাদিসের মানঃ **সহীহ (Sahih)** 👤 বর্ণনাকারীঃ আবু যার আল-গিফারী (রাঃ) ✅ পুনঃনিরীক্ষণঃ **✓** 📖 সুনান আবু দাউদ (তাহকিককৃত)

📖 ২৫/ কুরআনের কিরআত ও পাঠের নিয়ম (كتاب الحروف والقراءات)

আর আমরাও এমনটাই মনে করি।

বাকি আল্লাহু আলম।

## পৃথিবী থেকে প্রচলিত সূর্যের দূরত্ব নিয়ে, গ্লোব আর্থারদের দলিল খণ্ডন!

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত? ইংরেজ আমেরিকান দার্শনিক ওয়াল্টার স্টেচস বলেছেন: "সূর্য স্থির রয়েছে এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, এ ধারণাটি ভুল। বরং পৃথিবী স্থির, সূর্য তার চারপাশে ঘুরে। তবে কোপার্নিকাস বলেছেন যে, "সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। সূর্যই পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করে" কাজেই, কেউ যদি বিশ্বাস করে যে সূর্য স্থির পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তবে এমন কেউ নেই যে প্রমাণ করতে পারে যে সে ভুল। "!!!

উৎস : ওয়াল্টার স্টেজ, 1998, ধর্ম ও আধুনিক যুক্তি, অনুবাদ করেছেন ইমাম আবদেল-ফাত্তাহ ইমাম, ম্যাডবুলি লাইব্রেরি, কায়রো, মিশর)

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫ কোটি কিমি.। এই দূরত্বটি নির্ধারণ করা হয় নিউটনের সমীকরণের উপর ভিত্তি করে। পৃথিবীর এই বিশাল মাত্রায় আলোর উৎস সূর্যের প্রকৃত অবস্থান কিরূপ? এটি একই সময়ে পুরো পৃথিবীর বিপরীত অর্ধেক আলোকিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এছাড়া, পৃথিবীর এক প্রান্তে (দক্ষিণ বা উত্তর মেরু) একটি অঞ্চল রয়েছে যা সারা বছর পর্যায়ক্রমে অন্ধকার থাকে। আমরা এই দূরত্বটি ভুল প্রমাণ করব।

১- সূর্য পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থান করলে পৃথিবী সূর্যের আলোতে পৃথিবীর বিপরীত অর্ধগোলক একই সাথে আলোকিত হয় না কেন? পৃথিবীর যে কোন একটি মেরু (উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু) পর্যায়ক্রমে সারা বছর অন্ধকার থাকে কেন?

উল্লেখ্য, জ্যামিতিক হিসাব অনুযায়ী কোন আলোক উৎস দ্বারা একটি গোলকের সম্পূর্ণ অংশ আলোকিত করার জন্য আলোক উৎসটি ঐ গোলকের ব্যাসার্ধের ৭গুণ দূরে থাকাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, আলোক উৎসটি এতটুকু দূরে থাকলে গোলকের বিপরীত অংশসহ সম্পূর্ণ অংশটি আলোকিত হবে। সুতরাং, সূর্য যদি পৃথিবী থেকে (৬৩৭৯ ×

৭) কিমি বা ৩৭০০০ কিমি দূরত্বে থাকে তবে এই ভূগোলকের সম্পূর্ণ অংশটি একই সময়ে আলোকিত থাকবে। এমতাবস্থায় দুই মেরু অঞ্চলের কোন একটিতে তিন মাসের অধিক সময় ব্যাপি অবিচ্ছিন্ন রাত থাকার কোন প্রশ্নই আসে না।

তেমনিভাবে পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে মৃদু আলো (twilight) ঘটনাটি ঘটে যা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সূর্যের উপস্থিতি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সূর্যাস্তের পরে দিনের শেষ আলোর অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত (রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত) twilight থাকে। এই দুই পিরিয়ডের আলো যেমন পরোক্ষ আলোকসজ্জা আলোকিত হয়। দিনের বেলা সূর্যের উপস্থিতি মূলত মৃদু আলোর প্রখরকারির ভূমিকা রাখছে। কেউ হয়ত বলবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি পূর্ণ সূর্যগ্রহণের বাস্তবিক ভিডিও দেখেন তবে আপনি পূর্ণা অন্ধকার পাবেন না বরং সেই সুবহে সাদিকের শুরুতে যে twilight পাবেন সেটা দেখতে পাবেন।

[https://www.youtube.com/watch?v=xAuVs9\\_o9RY](https://www.youtube.com/watch?v=xAuVs9_o9RY)

<https://www.youtube.com/watch?v=G10m2ZZRH4U>

যা রঙিন বস্তুগুলো সব দেখতে পাবেন আবছা আলোতো। দিবা রাত্রি আল্লাহর আলাদা সৃষ্টি তাই প্রমাণ করে। যদি গোলকের ব্যাখ্যাটি প্রথমটিতে কিছুটা যুক্তিযুক্ত ধরা যায়, তবে দ্বিতীয়টিতে এর কোনও ভূমিকা নেই।

২. এই বিশাল তাপমাত্রার সূর্য কীভাবে গোলকের পৃষ্ঠতলটিকে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে উত্তপ্ত করতে সক্ষম হয়? যেহেতু আমরা পাই নিরক্ষরেখার উপর তাপ ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং দুই মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা - ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে আসে। যেই সূর্য ১৫০ মিলিয়ন কি.মি. (১৫ কোটি কি.মি.) দূরে থেকে ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পারে সেটি আবার নিরক্ষরেখা থেকে মাত্র ১০ হাজার কিমি দূরের বরফ প্রাচীর গলাতে পারে না এটি কেমন হাস্যকর কথা না!



## <https://www.quora.com/Is-the-equator-closer-to-the-North-Pole-or-South-Pole>

৩. যদি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে (কেপলারের গাণিতিক থিউরী অনুযায়ী)। ফলশ্রুতিতে, সূর্য থেকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর নিকটবিন্দুর দূরত্ব ও দূরবিন্দুর দূরত্বের মাঝে পার্থক্য প্রায় (১৫২.১-১৪৭.১ মিলিয়ন কি.মি.) = ৫০ লক্ষ কিলোমিটার হয়। তবে এই দূরত্বে সূর্য থেকে নিকটে থাকার দরুন প্রখর উত্তাপে পৃথিবী গলে যাওয়ার কথা। আবার বিপরীতে সূর্য থেকে দূরে থাকার দরুন পৃথিবী চিরতরে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার কথা। কেননা, যদি ১০ হাজার কি.মি. দূরত্বের (বিশুব্রেখা থেকে মেরুবিন্দুর দূরত্ব) কারনে তাপমাত্রার পার্থক্য ১০০ ডিগ্রি হয় হয় তবে আমরা ৫০ লক্ষ কিলোমিটার পার্থক্যের ক্ষেত্রে (তাদের গাণিতিক যুক্তির বাস্তবতা) কি ভাবতে পারি?

### **"চাঁদের নিজস্ব আলো নেই" এই ধারণা কবেকার?**

বলতে পারেন....!

"চাঁদের নিজস্ব আলো নেই" এই ধারণা কবেকার?

এই বিষয়টি কবে দুনিয়ার মানুষ জানতে শুরু করল?

নিশ্চয়ই বলবেন খুব সাম্প্রতিক কালে হয়তো কোন বিজ্ঞানী বা মহাকাশ সংস্থার

গবেষণায় এটি উঠে এসেছে..। আর কিছু বিজ্ঞান ভজনা করা কতিপয় মুসলিম

দাবিকারী গণ এটাও দাবি করে বসে যে কুরআনে নাকি ১৪০০ বছর আগেই এই

বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেক বিদ্বান এই নিয়ে কথার ফুলঝুরি ফোটাতে পারঙ্গম হন।

তাহলে এবার মূল প্রশ্নে আসি, উপরিস্থ বিষয়ে যা জানেন সবটাই আগাগোড়া

মিথ্যা।

বিজ্ঞান বা কোন মহাকাশ সংস্থা এটি গবেষণা করে বেরও করে নি, আর আসমানী কোন কিতাবেও এই কথা বলা হয় নি যে চাঁদের আলো নিজস্ব নয়।

চাঁদের আলো নিজস্ব। চাঁদের মাঝে যাবতীয় ক্ষমতা রয়েছে আলো নির্গত করার, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ, রেড মুন, ব্লু মুন ইত্যাদি নিদর্শন সংগঠিত করাইহা আল্লাহর কর্তৃত্বের একটি নিদর্শন।

এই বিষয়ে খুব ভাল করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এখানে যেই বিষয়টি নিয়ে শ্রোতের বিপরীতে দাড় টানবো তা হচ্ছে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চাঁদের নিজস্ব আলো আছে এবং আলো নেই এটি বর্তমান কালের কোন বিজ্ঞানের তত্ত্ব নয় বরং এটি গ্রিকদের থেকে আগত। আর গ্রিকরা শিখেছে মিশর থেকে, মিশর শিখেছে ইহুদীদের থেকে, ইহুদীরা নিয়ে আসে ব্যাবিলনের নিষিদ্ধ বিদ্যা থেকে। যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা তার দুই ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন মানব জাতির পরীক্ষার জন্যে। বলে রাখা ভালো যে যাদুর অনেকগুলো ধাপ আছে। আমরা সচরাচর যেসব শুনে বা দেখে থাকি সেগুলো সাধারণ শ্রেণীর যাদু। যাদুর উচ্চতর শাখা হচ্ছে কাব্বালিস্টিক ও হামেটিকস বিদ্যা। এখানে রীতি মত গাণিতিক সূত্রাবলী দিয়ে এইসব চর্চা করা হয়। যাদুর একটি মৌলিক নীতি হল বাস্তব বিষয়ের কোন বিপরীত কথা বলা, যা না ,

মিথ্যা, অসম্ভব এমন কিছু কথামালা দ্বারা কার্য সম্পাদন করা।

এখন আসি কুরআন ও হাদীসে এই চাঁদের বিষয়ে কি কি বলে;

সূরা ইউনুস আয়াত ৫

সূরা আল-ফুরকান আয়াত ৬১

সূরা নূহ আয়াত নং ১৬

সূরা আল-আহযাব আয়াত ৪৬

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ আয়াত ৮

সূরা ইউনুস আয়াত ৫

অনুবাদসমূহঃ

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময়... । -(আল বায়ান ফাউন্ডেশন, )

তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়... -  
(তাইসিরুল)

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন... -  
(মুজিবুর রহমান)

তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে  
স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে... (Muhiuddin Khan)

সূরা আল-ফুরকান আয়াত ৬১

অনুবাদসমূহঃ

বরকতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশালকায় গ্রহসমূহ। আর তাতে  
প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। -(আল বায়ান ফাউন্ডেশন)

কতই না কল্যাণময় তিনি যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন আর  
তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর আলো বিকিরণকারী চন্দ্র। -(তাইসিরুল)

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন  
করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! -(মুজিবুর রহমান)

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন  
সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। (Muhiuddin Khan)

সূরা নূহ আয়াত নং ১৬

অনুবাদসমূহঃ

আর এগুলোর মধ্যে চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আলো আর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন  
প্রদীপরূপে'। - (আল বায়ান ফাউন্ডেশন)

আর তাদের মাঝে চাঁদকে বানিয়েছেন আলো এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপা -  
(তাইসিরুল)

এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন  
প্রদীপ রূপে; - (মুজিবুর রহমান)

এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন  
প্রদীপরূপে। (Muhiuddin Khan)



তিনটি আয়াতে যে দুটি শব্দ চাঁদের আলো বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল  
আরবি শব্দ “নূর” (যার অর্থ হলো আলো অনেক ক্ষেত্রে আলোর উৎস ) ও

“মুনির” যার অর্থ উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জ্যোতির্ময় ( প্রতিফলিত আলো নয় )।

এখানে এই শব্দ দুটির কোনটিই চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত আলো হিসাবে ব্যাখ্যা  
করে না বরং নূর শব্দের দ্বারা এটাই উল্টো প্রমাণিত হয় যে চাঁদের নিজস্ব আলো

আছে। কারণ আল্লাহর ৯৯টি নামের একটি হলো “আন্-নূর” যার অর্থ “আলো”। যা  
কোনভাবেই প্রতিফলিত আলো হতে পারে না। ২৪ নং সূরা নূর এর অনুবাদকৃত  
বাংলা নাম “আলো” ও ইংরেজি নাম “The Light.”

মুনির” শব্দের মাধ্যমে অনেকে চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত প্রমাণ করতে চান।

মুনির শব্দের অর্থও কোন ভাবেই প্রতিফলিত আলো না। প্রতিফলিত আলো দাবি করার জন্য নূর বা মুনির শব্দের আগে প্রতিফলিত, ধার করা কিংবা এসম্পর্কিত অর্থে কোন শব্দ থাকা প্রয়োজন যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। সূরা ৭১ নূহ এর ১৬ নং আয়াতে নূর শব্দের আগে থাকা “ফিহিনা” শব্দের অর্থ (তারমধ্যে বা তারমাঝে) যা তাদের ভ্রান্ত দাবির বিপক্ষে যায়। মুনির শব্দের অর্থও যে প্রতিফলিত আলো হয় না সেটি সূরা আল-আহযাব ৩৩ এর ৪৬ নং আয়াতের অনুবাদগুলো লক্ষ্য করলেই নিশ্চিত হওয়া যায় যেখানে মুনির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত এ আয়াতে বলা হয়েছে “ ওয়া সিরাজান মুনিরা”। উল্লেখ্য “সিরাজ” শব্দের অর্থ বাতি, প্রদীপ বা ল্যাম্প এবং প্রদীপের আলো কখনো প্রতিফলিত আলো হয় না কারন প্রদীপ বা বাতি সরাসরি আলোর উৎস।

দেশের প্রখ্যাত বাংলা অনুবাদগুলোর মধ্যে কোথাও চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত বা ধার করা আলো বলা হয়নি। অন্যদিকে কোরানের প্রখ্যাত এবং পুরনো ইংরেজি অনুবাদক ( Yusuf Ali, Pickthall, Shakir, Sarwar) সহ কেউই চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত আলো অনুবাদ করেন নি, কিন্তু তুলনামূলক নতুন এবং সাম্প্রতিক অনুবাদক Sahih International তার অনুবাদে “নূর” শব্দের অনুবাদ করেছেন (derived light -10:5) এবং (reflected light – 71:16) যা একটি ভুল এবং অসাধু অনুবাদ। হযরত জাকির নায়েকও একই ধরনের দাবি করেন। তাদের দাবি অনুযায়ী “নূর” শব্দটিকে (Reflected Light) বা প্রতিফলিত আলো অনুবাদ করলে ২৪ নং সূরা নূর এর ৩৫ নম্বর আয়াত এর ইংরেজি অনুবাদ দাড়ায়,

**Allah is the (Reflected Light) of the heavens and the earth**

বাংলা অনুবাদ দাড়ায়

“আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিফলিত আলো” ( নাউজুবিল্লাহ)।

উল্লেখ্য, **Sahih International** এই আয়াতে “নূর”কে **Reflected Light** অনুবাদ করেনি।

এমনকি এই সম্পর্কিত তিনটি আয়াতের তাফসিরে কোন তাফসির কারক এই দাবি করেননি যে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই।

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ আয়াত ৮

এবার দেখুন কোরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যা প্রমাণ করে যে চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

অনুবাদসমূহঃ

আর চাঁদ কিরণহীন হবে, -(আল বায়ান ফাউন্ডেশন)

চাঁদ হয়ে যাবে আলোকহীন -(তাইসিরুল)

চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবো(Muhiuddin Khan)

**Sahih International: And the moon darkens.**

এই আয়াতের অনুবাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই আয়াতের তাফসীরে

একটি ব্যাপার খুবই লক্ষণীয় এই যে, সকল তাফসীরকারকগণ একমত যে কেয়ামতের পূর্বে চন্দ্রকে জ্যোতিহীন বা আলোকহীন করে নেয়া হবে। পরের আয়াতেই বলা হচ্ছে যে চন্দ্র এবং সূর্যকে একত্রিত করা হবে। তাফসীরকারক বলেছেন সূর্যও আলোকহীন হয়ে যাবে এবং তাদেরকে একত্রে লেপটিয়ে দেয়া হবে

বা একত্রিত করা হবে যার বর্ণনা সহিহ হাদীসেও আছে । অর্থাৎ এই আয়াতের তাফসীরে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে কেয়ামতের পূর্বে প্রথমে চাঁদকে আলোকহীন করা হবে যা সরাসরি প্রমাণ করে যে কোরআন অনুযায়ী চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

সহীহ হাদীস থেকেও প্রমাণ করা যায় যে চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

গ্রন্থের নামঃ সহীহ বুখারী (ইফাঃ)

হাদিস নম্বরঃ [2973]

অধ্যায়ঃ ৪৯/ সৃষ্টির সূচনা

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিচ্ছদঃ ১৯৮৬. চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এর জন্য মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য লঙ্ঘন করতে পারে না। **حَسَبَ** শব্দের বহুবচন, যেমন **شِهَابٍ** এর বহুবচন **شُهُبَانِ** এর অর্থ জ্যোতি **القَمَرَ** চন্দ্র সূর্যের এক্তির জ্যোতি অপরটিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। **سَاقِ النَّهَارِ** রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়া **نَسْلُخُ** আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় **وَاهِيَةً** এবং **وَهْيَهَا** এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। **أَرْجَائِهَا** তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উক্তি **أَعْطَشَ وَجَنُّ عَلَى أَرْجَاءِ الْبُرِّ** কূপের তীরে **كُورَتِ** অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে **وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ** এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং তার যে জীবজন্তু একত্রিত করল। **اِنْسَقَ** বরাবর হল। **بُرُوجًا** চন্দ্র সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। **الْحَرُورُ** গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সাথে প্রবাহিত হয়। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, **حَرُورُ** রাত্রিবেলার আর **سَمُومُ** দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় **يُولِجُ** অর্থ প্রবিষ্ট করে বা করবে **وَلِيَجَةَ** অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ।

২৯৭৩। মুসাদ্দাদ (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়কে লেপটিয়ে দেয়া হবে।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বিষয়টি নিশ্চিত যে কেয়ামতের দিন চন্দ্র এবং সূর্যকে লেপটিয়ে দেওয়া হবে যাতে তাদের উভয়ের আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে যা আবার প্রমান করে যে চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি (রহ) একইভাবে ব্যাখ্যাটি করেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আরেকটি বিষয় বলা হচ্ছে যে চন্দ্র এবং সূর্য একটির জ্যোতি অপরটিকে ডাকতে পারে না আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এই দাবিটিও প্রমান করে যে চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের জ্যোতি রয়েছে কারন সেটা না হলে চন্দ্রের জ্যোতি সূর্যকে ডাকতে পারে না এ দাবিটি করা হতো না। আর আমরা বাস্তবিকই দেখি সূর্যের আলো চাঁদকে ঢাকতে পারে না।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “নসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী” (খন্ড ৭ পৃষ্ঠা ৩৪৫ পরিচ্ছেদ ১৯৮৮) তে বলা হচ্ছে (চাঁদ সূর্য) উভয়টির আলো অপরটির আলোকে গোপন করতে পারে না আর না তা করা উভয়ের তরে যতচিত্ত। এই দাবিটিও আগের দাবির মতোই যা প্রমান করে চাঁদের আলো সূর্যের আলোকে গোপন করতে পারে না। অর্থাৎ চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

তাফসীর ইবনে কাসিরের সূরা ইউনুস এর (১০ঃ৫-৬) আয়াতের তাফসিরেও একই রকম দাবী করা হচ্ছেঃ

সুতরাং কোরআন ও হাদীসের চারটি দাবি প্রমান করে চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

১) চাঁদের আলো বর্ণনায় নূর শব্দের ব্যবহার (১০ঃ৫) (৭১ঃ১৬)

২) কেয়ামতের দিন চাঁদ এবং সূর্যকে একত্রিত করার পূর্বেই চাঁদকে জ্যোতি হীন করে নেয়া হবে। (৭৫ঃ৮-৯)



৩) চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবো বুখারী (ইফাঃ) ২৯৭২  
 ৪) চন্দ্রের জ্যোতি সূর্যকে ঢাকতে পারে না। (হাদীসটির ব্যাখ্যায় বর্ণিত তথ্যসূত্র)  
 চাঁদ হচ্ছে আমাদের দিন/তারিখ নির্ধারণের জন্য  
 ,সমুদ্র,মরুভূমিতে পথ চিনতে দিক নির্দেশনা পাওয়ার উপলক্ষ্য হিসেবে শীতল  
 আলো দায়ী আসমানি সৃষ্টি।

لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ  
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ إِلَّا  
 তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ  
 করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের)  
 হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য  
 তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।(১০:৫)

তাহলে এবার আসি তাহলে চাঁদের আলো নেই এই ভ্রান্ত কথা কোথা থেকে  
 আসলো:

গ্রিকদের কিছু লোকের যারা নিষিদ্ধ বিদ্যার চর্চা করত তারা এই কথা প্রচার করে  
 যাদুর স্বার্থে। এমনকি এইসব যাদুকরদের বিকৃত রুচির বিভিন্ন রিসুয়াল পালন,  
 নরবলি দিতে হত। সৃষ্টি জগতের বিপরীত বিশ্বাস লালন করতে হত। এইসবই  
 তাদের পূজনীয় অভিশপ্ত আত্মার অর্থাৎ শয়তানের জন্যে করত।  
 সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব প্রচলিত ছিল না।

কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি:

**Thales (585 BC):**

The moon is lighted from the sun. 29; 360. Thales et al. agree with the mathematicians that the monthly phases of the moon show that it travels along with

the sun and is lighted by it, and eclipses show that it comes into the shadow of the earth, the earth coming between the two heavenly bodies and blocking the light of the moon (Doxographi on Thales, Aet. ii. 1 ; Dox. 327) (6).

Anaxagoras (500-428 BC) considered the moon be to a false-shining star (255).

The Doxographist elaborate further on this:

The moon is below the sun and nearer us. The sun is larger than the Peloponnesos. The moon does not have its own light, but light from the sun (The Doxographists on Anaxagoras, Hipp. Phil. 8 ; Dox. 561) (260-1).

Empedocles (490-430):

As sunlight striking the broad circle of the moon.  
154. A borrowed light, circular in form, it revolves about the earth, as if following the track of a chariot (Empedocles, translations of the fragments I) (177).

Lucretius (100-50 BC):

How then, if the sun is so small, can it give of such a flood of light (p.189)?

The moon, too, whether it sheds a borrowed light upon the landscape in its progress or emits a native radiance from its own body. What then of the moon? It may be that it shines only when the sun's rays fall upon it. Then day by day, as it moves away from the

sun's orb, it turns more its illuminated surface towards our view till in its rising it gazes down face to face up the setting of the sun and beams with lustre at the full. Thereafter, it is bound to hide its light bit by bit behind it as it glides around heaven towards the solar fire from the opposite point of the zodiac (192-193) (Lucretius, The Nature of the Universe).

পূর্ণিমার চাদ (নিজস্ব আলোয় আলোকিত) রাজধানীর ঢাকার আকাশে:



গত 1-9-2020 ও 2-9-2020 তারিখ রাত নয়টায় কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে আমি নিজেই পূর্ব আকাশে এই চাঁদকে দেখেছি। আপনারাও অনেকেই নিশ্চই দেখেছেন। আমার কাছে ভালো ক্যামেরা না থাকায় ছবি তুলতে পারিনি। নিচের ছবিটা অন্য এক ভাইয়ের টাইমলাইন থেকে নিয়েছি। মাশাআল্লাহ ছবিটা ভালো হয়েছে। আমিও এমন একটা ছবি তুলতে না পারায় আফসোস করছিলাম। আলহাদুলিল্লাহ আল্লাহ পাইয়ে দিয়েছেন। তবে ছবিতে যতটা আলোকিত দেখা যাচ্ছে, বাস্তবে এর চাইতেও বেশি আলোকিত, উজ্জ্বল ও জোতির্ময় ছিল। যারা দেখেছে, তারা অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন। মোটা মুটি অনেকেই চাঁদের এতো উজ্জ্বলতা দেখে অবাক হয়েছেন।

নিজ চোখে দেখার পরেও, কিছু মানুষ অপবিজ্ঞানের দ্বারা মগজ ধোলাইয়ের কারণে বলবে এটা “ধার” করা আলো। অর্থাৎ চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো। নাউযুবিল্লাহ। এটা তো কমন সেন্স। আল্লাহ সূর্য ও তারকাকে নিজস্ব আলোয় আলোকিত করেছেন। আর চাঁদকে প্রতিফলিত করবেন? আল্লাহর খাজানায় কি আলোর অভাব পড়েছে? নাউযুবিল্লাহ। চাঁদকে কেন ধার করে আলো নিতে হবে? প্রতিফলিত কেন হতে হবে? আর তাছাড়া আল্লাহ তো স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন: " তিনি চাঁদকে করেছেন দীপ্তিময়, জোতির্ময়"।

আল্লাহ বলেন:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا  
কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন  
সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। [ সূরা ফুরকান ২৫:৬১ ]

আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে  
স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্ম মনযিল  
সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই  
সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন  
লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। [ সূরা ইউনুস ১০:৫ ]

এরকম স্পষ্ট আয়াত দেখার পরেও যারা অপবিত্রতার সাথে সুর মিলিয়ে বলবে চাঁদের  
আলো প্রতিফলিত আলো, তাদের চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে?

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দাজ্জালীয় অপবৈজ্ঞানিক ইলমী ফেতনা থেকে  
হেফাজত করুন আমিন।

**সূর্যের মঞ্জিল চাঁদের মত নয় বিধায় সূর্যদোয়ের দেশ আছে, কিন্তু চন্দ্রদোয়ের নির্দিষ্ট কোন দেশ নেই:**

খালিক, মালিক, রব, মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

النَّهَارُ آيَةٌ وَاللَّيْلُ آيَةٌ فَمَحَوْنَا الْيَتِيمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا  
وَالْحِسَابَ السِّنِينَ عَدَدًا وَلِتَعْلَمُوا بِكُمِّرٍ مِّنْ فَضْلًا لَّتَبْتَغُوا مَّغْبُورًا  
تَفْصِيلًا فَصَلَّنَاهُ شَيْءٌ وَكُلُّ

অর্থ : “আমি রাত্রি ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিশ্চিত  
করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার  
উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের মহান রব তায়ালা উনার  
মুবারক অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা জানতে পারো  
বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে  
বর্ণনা করেছি।” (পবিত্র সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ১২)

অত্র পবিত্র আয়াতের মধ্যে রাত ও দিনের আবর্তনের মাধ্যমে বছর  
হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আর রাত ও দিনের আবর্তনের  
বিষয়টি সূর্যের আবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এখানে সৌরবর্ষের  
বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

আবার মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

لِتَعْلَمُوا نَازِلَ مَوْجِدِهِ وَفَقْدَرَهُ نُورًا وَالْقَمَرَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ جَعَلَ الَّذِي هُوَ  
سَابِقُ السِّنِينَ عَدَدًا

অর্থ : “মহান আল্লাহ পাক যিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন উজ্জ্বল  
আলোকময় করে আর চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে।  
অতঃপর নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মঞ্জিলসমূহ যাতে তোমরা

জানতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।” (পবিত্র সূরা ইউনুস: আয়াত ৫)

অত্র আয়াতের দ্বারা সৌরবর্ষের পাশপাশি চন্দ্রবর্ষের বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু সৌরবর্ষ ও চন্দ্রবর্ষ গণনার মধ্যে একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর তা হলো- সূর্যের মঞ্জিল চাঁদের মত নয়।

সূর্যের আকৃতি সারা মাসব্যাপী একই থাকে। কিন্তু চাঁদের আকৃতি মাসের শুরুতে ধনুকের মতো বাঁকা (হিলাল) থাকলেও, আকৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মাসের মাঝামাঝি সময়ে জ্যোসনা আসে। আবার জ্যোসনা হতে চাঁদ ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে এক সময় অমাবস্যা পৌঁছায়।

আর তাই দেখা যায় সূর্য সারাবছরব্যাপী একই দেশ থেকে প্রথম উদিত হলেও চাঁদ প্রত্যেক মাসে একই দেশে উদিত হয় না। বরং যে দেশে বা অঞ্চলে প্রথম অমাবস্যা দশায় পৌঁছায় তার কাছাকাছি দেশ বা অঞ্চল থেকে চাঁদ উক্ত মাসে প্রথম দেখা যায়। কেননা শরীয়ত অনুযায়ী আকাশে খালি চোখে বাঁকা চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাসের শুরু হয়। আর অমাবস্যা দশা থেকে খালি চোখে দৃশ্যমান উপযোগী হিলাল দশায় পৌঁছাতে প্রায় ১৭- ২৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়।





সুতরাং সউদী আরব থেকে প্রথম চাঁদ দেখা যায় কিংবা পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট দেশ থেকে প্রথম চাঁদ দেখা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি বক্তব্যগুলো সঠিক নয়।

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক ইলম ও সমঝ দান করুন। আমীন!

### আকাশের দূরত্ব এবং লো আর্থ আরবিটে রকেটের বাধাপ্রাপ্তি নিয়ে একটি বিশ্লেষণ:

দুইটি ব্লগ থেকে দুইটি হাদিস নেয়া হয়েছে। প্রথমে আমরা হাদিসগুলো দেখবো, তারপর কিছু আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

#### (হাদিস নং - ১) ৫০০ বছরের রাস্তার বর্ণনা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

الذي يا وال تي لا يها مسيرة خمس مائة عام ما بين السماء  
وما بين كل سماء مسيرة خمس مائة عام وما بين السماء



ال سابعة وال كرسي مسيرة خمس مئة عام وما بين الكرسي  
وال ماء مسيرة خمس مئة عام وال عرش على الماء والله عز وجل  
على ال عرش يعلم ما أنتم عليه

“দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ’ বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এমনি সপ্তমাকাশ এবং কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। আরশ হচ্ছে পানির উপরো আর আল্লাহ তাআলা আরশের উপরো তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়”।

হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই হাদীছ ইবনে মাহদী বর্ণনা করেন আসেম হতে, আসেম বর্ণনা করেন যির্ হতে, তিনি বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে। অনুরূপ বর্ণনা করেন মাসউদী আসেম হতে, তিনি আবি ওয়ায়েল হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রঃ) উপরোক্ত সনদ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ অনেক সনদে এই বর্ণনা এসেছে।

আববাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

بَيْنَهُمَا لُحُومٌ أَعْلَمُ. قَالَ تَذَرُونَ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَلْ مَسِيرَةٌ سَنَةٌ وَكَثُفٌ خَمْسِينَ سَمَاءً إِلَى سَمَاءٍ كُلِّ وَمِنْ سَنَةٍ خَمْسِينَ مَسِيرَةٌ وَالْعَرْشُ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ نَةً وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ خَمْسِينَ سَدَ وَقَدْ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَعَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ

“তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব কত?” আমরা বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে অধিক জানেন। তিনি বললেন, “আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। প্রত্যেক আকাশের ঘনত্বও (পুরুত্ব) পাঁচশ বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এর উপরে রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকাণ্ডই তাঁর অজানা নয়”। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

**ইমাম আলবানী(রঃ) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন, দেখুনঃ শরহুল আকীদুত তাহাবীয়া, (১/৩০৫)।**

**(হাদিস নং - ২ ) ৭১ / ৭২ / ৭৩ বছরের রাস্তার বর্ণনা।**

আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের হাদীছটি লেখক এখানে সংক্ষিপ্ত করে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনাটি ঠিক এ রকম, আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন,

عليه وسلم فَمَرَّتْ بِهِمْ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
الْمُزْنِ قَالُوا سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابُ  
الْعَنَانُ جَيِّدًا قَالَ هَلْ دَاوُدَ لَمْ أَتِقْنِ وَالْمُزْنَ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالَ أَبُو  
إِنَّ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا تَذَرُونَ مَا بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالُوا لَا نَذَرِي قَالَ  
ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ قَهَا كَوَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٍ وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْ  
لُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ سَمَوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ  
ثُمَّ بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْ عَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ وَرُكْبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ  
مَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَدِّ  
تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ

“আমি একদা একদল সাহাবীর সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে ছিলেন। তখন তাদের উপর দিয়ে এক খন্ড মেঘ অতিক্রম করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমরা এটিকে কী বলো? তারা বললোঃ **ال سحب** “এটিকে আমরা মেঘ বলি”। তিনি তখন বললেনঃ **وال مزن** (আলমুযন)। সাহাবীরা বললোঃ আমরা এটিকে মুযনও বলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ **وال ع نان** (আলআনান)। সাহাবীগণ বললোঃ আমরা আনানও বলি। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেনঃ আমি আনান শব্দটি ভালভাবে বুঝতে পারিনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি জানো আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব কতটুকু? সাহাবীগণ বললোঃ আমরা জানি না। তিনি বললেনঃ উভয়ের মধ্যে রয়েছে হয় একাত্তর বছরের, না হয় বাহাত্তর বছরের না হয় তেহাত্তর বছরের দূরত্ব। এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে একই রকম। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি আসমান গণনা করলেন। সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের উপর হতে নীচের দূরত্ব (গভীরতা) হচ্ছে এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি ওয়াল (বিশাল আকারের আট ফেরেশতা)। তাদের হাঁটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তাদের পিঠে রয়েছে আল্লাহর আরশ। আরশ এত বিশাল যে, তার নীচের অংশ হতে উপরের ছাদ পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরশের উপরে”।

তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ, (১/২০৬)। আলেমগণ হাদীছটি সহীহ ও যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম হাদীছটি সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী

বলেনঃ হাদীছটি হাসান গরীবা ইমাম আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ  
সিলসিলায়ে যঈফা, হাদীছ নং- ১২৪৭।

উপরোক্ত হাদিস দুটি একটি ইসলামিক ব্লগ থেকে নেয়া হয়েছে।

এবার নিচে আমরা আরেকটি ব্লগের ৭১ / ৭২ / ৭৩ বছরের বর্ণনা নিয়ে এই হাদীছটি দেখবো।

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি বাতহা নামক স্থানে একদল লোকের সাথে ছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু  
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের সাথে ছিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ তাকে অতিক্রম  
করো। তিনি মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা এটাকে কী নামে অভিহিত  
করো? তারা বলেন, মেঘ। তিনি বলেন, এবং মুয্না। তারা বলেন, মুয্নও বটো তিনি  
বলেন, আনানও। আবু বাক্র (রাঃ) বলেন, তারা সবাই বললেন, আনানও বটো তিনি  
বলেন, তোমাদের ও আস’ মানের মাঝে তোমরা কত দূরত্ব মনে করো? তারা  
বলেন, আমরা অবগত নই। তিনি বলেন, তোমাদের ও আসমা’নের মাঝে ৭১ বা ৭২  
বা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এক আসমান থেকে তার উর্ধ্বের আস’ মানের দূরত্বও  
তদ্রূপ। এভাবে তিনি সাত আস’ মানের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম  
আকাশের উপর একটি সমুদ্র আছে যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার ব্যবধান  
(গভীরতা) দু’ আস’ মানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপর রয়েছেন আটজন  
ফেরেশতা, যাদের পায়ের পাতা ও হাঁটুর মধ্যকার ব্যবধান দু’ আসমা’নের মধ্যকার  
দূরত্বের সমান। তাদের পিঠের উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নিচের  
ব্যবধান (উচ্চতা) দু’ আসমা’নের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন  
বরকতময় মহান আল্লাহ।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৯৩

আসমানের এই দূরত্বের ইউনিট কি অথবা কোন মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে বলা সে ব্যপারে কোন সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন গতিতে উর্দোলোক গমনের গতির হিসাবে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়কাল ধরা হয়েছে, এসব ব্যপারে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। (AMSBD)

**RM:** এবার আল্লাহ প্রদত্ত এলম দিয়ে, আল্লাহর উপর ভরসা করে কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি। ভুল হলে আমাকে সতর্ক করে দিবেন আশা করি। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম হজরত গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উপরোক্ত হাদিস দুটোর তাহকীকে আপনারা দেখলেন, ৫০০ বছরের বর্ণনাকে যঈফ বলা হয়েছে। আর ৭১ / ৭২ / ৭৩ বছরের বর্ণনা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ সহীহ, কেউ যঈফ বলেছেন। তবে ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম (র:) হাদীছটি সহীহ বলেছেন।

তাহলে আমরা আকাশের দূরত্ব কোনটা ধরবো? যেহেতু ৭১, ৭২ বছরেরটা অনেকেই সহীহ বলেছেন, আমরা সেটাকেই ধরে নিতে পারি। আর এটা বাস্তবতার সাথেও মিলে যায়। যেমন ৭২ বছর যদি নেই, তাহলে ৫০০ বছরের ব্যাপারটাও সামঞ্জস্য করা যায়।  $৭২ * ৭ = ৫০৪$ । অর্থাৎ ৭২ বছরের রাস্তা অনুযায়ী ৭ম আসমানের দূরত্ব ৫০০/ ৫০৪ বছর।

আরেকভাবেও চিন্তা করা যায়। আর তা হলো পায়ে হাঁটার দূরত্ব এবং বাহনের দূরত্ব। অর্থাৎ পায়ে হেটে গেলে লাগবে ৫০০ বছর এবং ঘোড়ায় করে গেলে লাগবে ৭২ বছর। দুইও ভাবেই দুটি হাদিসের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, আলহামদুলিল্লাহ। বাকিটা আল্লাহু আলম।

এখন কথা হলো এই ৭২ বছরের রাস্তা কি দ্বারা পরিমাপ করা হবে? আমরা জানি জান্নাতের দূরত্ব বা অন্য কোনো দূরত্ব বুঝতে আল্লাহর রাসূল (স:) ঘোড়ার গতি

দিয়ে বুঝাতেন। অর্থাৎ একটি ঘোড়া ১ বছরে যত দূর যেতে পারে সেটাই ১ অশ্ববর্ষ। তাহলে আমরা ৭২ বছরেরটাও ৭২ অশ্ববর্ষ হিসেবে ধরতে পারি। (আল্লাহু আলম)।

**কোয়ার্টার হর্স(Quarter horse):** এদের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘন্টায় প্রায় ৪৮ -৫০ মাইল। ৫০ মাইল ধরে হিসাব করলে ১ দিনে যায়  $(৫০*২৪) = ১২০০$  মাইল। ১ মাসে  $(১২০০*২৭$  চন্দ্র মাস ২৭ দিনে) $= ৩২৪০০$  মাইল। ১ বছরে  $(৩২৪০০*১২) = ৩৮৮৮০০$  মাইল। ৭২ বছরে  $(৩৮৮৮০০*৭২) = ২৭৯৯৩৬০০$  মাইল। এটাকে চূড়ান্ত হিসাব হিসেবে ধরার সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহর রাসূলের সময় ঘন্টা বা দিন গণনা করা হতো কিভাবে তা জানিনা। আর তাছাড়া এটা চন্দ্র বছর নাকি সৌর বছর অনুযায়ী হবে, তাও জানিনা। আর বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে এটা বের করতে যাওয়াটাও বোকামি। কারণ কুফফাররা সময়কে এলোমেলো করে দিচ্ছে। সময়ের গন্ডগোল নিয়ে অনেক আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

(মজার ব্যাপার হচ্ছে কথিত বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩৮৪৪০০ কি মি (২৩৮৮৫৫ মাইল)। আর আমাদের এই হিসেবে এসেছে ১ বছরে  $(৩২৪০০*১২) = ৩৮৮৮০০$  মাইল ) সেই অনুযায়ী চাঁদের দূরত্ব হয়তো ১ অশ্ববর্ষ বা কিছু কম। আল্লাহু আলম। যেটাকে কাফেররা নাম দিয়েছে ১ আলোকবর্ষ।

যাইহোক আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মাঝামাঝি একটা দূরত্বকে ধরে নিচ্ছি। কারণ ৭১ বছরের রাস্তা এবং ঘোড়ার গতি যদি আরো বেশি হয় তাহলে দূরত্ব আরো কমবে। অর্থাৎ ২ / ২.৫ কোটি মাইল। তাহলে প্রথম আকাশের দূরত্ব ২ / ২.৫ কোটি মাইল হতে পারে (আল্লাহু আলম)।

এবার আরেকটি প্রশ্ন চলে আসতে অপরের। তাহলে কিছু ভিডিওতে যে দেখা যায়, রকেটগুলো আকাশে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে, এটা কি? অর্থাৎ কোথায় ধাক্কা খাচ্ছে?

ওগুলো লো আর্থ অরবিট এ ধাক্কা খাচ্ছে।

উপরে হিসাবটা খেয়াল করুন ((৫০ মাইল ধরে হিসাব করলে ১ দিনে যায় (৫০\*২৪) = ১২০০ মাইল)) লো আর্থ অরবিট এর দূরত্বও ১২০০ মাইল। আল্লাহ তায়ালা হয়তোবা এখানে পানি বা অন্য কোনো কিছুর বিশেষ কোনো আবরণ বা পর্দা রেখেছেন। তাই এটা পার হওয়া যায়না।

এখন প্রশ্ন হলো, লো আর্থ অরবিট কি ১২০০ মাইল উপরে নাকি আরো আগে? কারণ রকেটগুলো ১ দিন পরে গিয়ে ধাক্কা খায়না। বরং আরো অনেক আগেই ধাক্কা খায়। রেড বুলের একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্যাপসুলটি ৩৯ কি মি (১২৮০০০ ফিট) উপরে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাহলে সেখানে বাধা পাওয়ার মতো বিশেষ কিছু আছে হয়তো। তাহলে আগের লো আর্থ অরবিটের হিসেবটা ভুল প্রমাণিত হলো। এতে তো আরো ভালো করে নাসার মুখোশ উন্মোচন হলো। ওরা নিজেরাই নিজেদের ভণ্ডামির ফাঁদে আটকা পরে গেলো।

তো উপরোক্ত পুরো আলোচনার সারমর্ম হলো : পৃথিবী থেকে ১ম আসমানের দূরত্ব আনুমানিক ২ কোটি মাইল (৭২ বছরের রাস্তা)। চাঁদের দূরত্ব ৩৮৮৮০০ মাইল (১ বছরের রাস্তা)। লো আর্থ অরবিট ১২০০ মাইল ( ১ দিনের রাস্তা)।

N:B: এখন সূর্য কোন দূরত্বে আছে তা জানি না। হয় চাঁদের কাছাকাছি ১ বছরের রাস্তার পরে আছে। অথবা ৭২ বছরের রাস্তার পর প্রথম আসমানে আছে। অর্থাৎ ২-৩ কোটি মাইলের ভিতরে আছে। তবে কথিত ১৫ কোটি মাইল দূরে নেই। (আল্লাহু আলাম)

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে আরেকবার পড়ুন। এবং কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাকে জানান।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরা

## আকাশ-সুউচ্চ জমাট ঢেউ ও সুরক্ষিত ছাদ:

২০১২ সাল, ক্রো৭৭৭ চ্যানেলের এডমিন তার ক্যামেরায় চাদের উপর অদ্ভুত তরঙ্গের প্রবহমানতা প্রত্যক্ষ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিষয়টি নিয়ে হইচই ফেলেন। প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে তার ক্যামেরার ত্রুটি মনে করা হলেও অন্যান্য ক্যামেরাতেও একই ফলাফলের জন্য সে ধারণা পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বের হাজারো শার্প আইড লোকেরা একই ফেনোমেনা তাদের ক্যামেরাতে লক্ষ্য করেন। একে নাম দেওয়া হয় 'Lunar Wave'। বিষয়টি এরূপ যে, চাদকে জুম করে স্থিরভাবে লক্ষ্য করলে একরকমের ঢেউয়ের প্রবহমানতাকে দেখা যায়। সেসব ঢেউ চাদের উপরে আড়াআড়িভাবে বহমান। দেখলে মনে হবে, সেখানে পানির একটি স্তরের উপরে চাদের অবস্থান। সেই লিকুইডের তরঙ্গের জন্য এবং চাদের মৃদুমন্দ শীতল আলোয় জমিনে দাঁড়িয়েই লুনার সার্ফেসে তরঙ্গ বইতে দেখা যায়। ঢেউ গুলো চাদের সার্কুলার স্ফেরয়েড আকৃতিকে বেষ্টন করে হচ্ছে না, অর্থাৎ এই সুক্ষ্ম ঢেউ গুলো বক্র নয়। বরং হোরাইজন্টাল। সুতরাং পুরো আকাশ জুড়েই এরূপ হচ্ছে যা প্রখর দিবালোকে দর্শনযোগ্য নহে। এই ফেনোমেনাকে কেন্দ্র করে 'হলোগ্রাম সান-মুন' সহ অনেকগুলো উদ্ভট এবং হাস্যকর কম্পাইরেন্সি থিওরিও গজিয়েছিল। যাহোক, সেদিকে যাচ্ছি না। এ ব্যাপারে মেইনস্ট্রিম সাইন্স কমিউনিটি থেকে কোন রেস্পন্স নেই। অধিকাংশই এর স্বীকৃতিই দিতে চায় না।

দেখুনঃ <https://m.youtube.com/watch?v=33fuxFl6rJg>



এবার নিচের ইসলামিক ডকুমেন্ট গুলোয় মনযোগ দেয়া যাক...

হযরত ইবনু আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে একটি লোক জিজ্ঞেস যে,  
"হে আল্লাহর রাসূল(সঃ)! এই আকাশ কি?" তিনি উত্তরে বলেন,"এটা  
হচ্ছে তরঙ্গ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।"

হাদিসটি মুসানাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

(তায়সীর ইবনে কাসীর-পারা ১৭-সূরা আশ্বিয়া এর তায়সীর দ্রষ্টব্য)

ইমাম আহমদ(র) বর্ণনা করেন যে,আবু হুরায়রা(রাঃ) বলেন, "একদিন  
আমরা রাসূল(সাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এ সময়ে একখণ্ড মেঘ  
অতিক্রম করলে তিনি বললেনঃতোমরা কি জান এগুলো কি? আমরা  
বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূল(সঃ)ই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ

"এগুলো হচ্ছে মেঘমালা।পৃথিবীরদিক-দিগন্তপ থেকে এগুলোকে হাকিয়ে  
নেওয়া হয় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর বান্দাদের নিকট যারা তাকে ডাকে না। "  
তোমরা কি জান তোমাদের উর্দ্ধদেশে এটা কি? " আমরা বললাম, আল্লাহ  
ও তার রাসূল(সঃ) অধিকতর জ্ঞাত। এটি হচ্ছে সুউচ্চ জমাট ঢেউ,এবং  
সুরক্ষিত ছাদ..... "

\*ইমাম তিরমিযী(রঃ) সহ একাধিক আলিম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

(আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা,প্রথম খন্ড পৃঃ৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য)

আকাশ সম্পর্কে একটি দুর্লভ বক্তব্য ও বর্ণনা

"অনেক বিজ্ঞানীরা বলে, আকাশ বলতে কি (?) মহাশূন্য, মহাশূন্য শূন্যের শূন্য।

এই আসমান বলতে অন্য কিছু নাই। কিন্তু কুরআন কি বলছে শুনুন। কুরআন বলছে: شِدَادًا سَبْعًا فَوْقَكُمْ وَبَيْنُنَا (আন নাবাঃ১২)

-আমি তোমাদের মাথার উপরে সাতটা কঠিন আসমানের স্তর রেখেছি।

সূরা মুলকের ৩নং আয়াতে আছে: بِأَقْطَابِ سَمَآوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي

ও

সূরা নূহের ১৫ নং আয়াতে আছে, طِبَاقًا أَوَاتٍ سَمَ سَبْعَ اللَّهُ خَلَقَ كَيْفَ تَرَوْنَ أَلَمْ

-

তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন।

সাত আসমান, শুধু সাত আসমান আছে তা(ই) না, সাত আসমান কি কি দিয়ে তৈরি সেইগুলো পর্যন্ত তাফসীরের কিতাবে আছে। প্রত্যেকটা আসমান আল্লাহ কি দিয়ে তৈরি করেছেন, আল্লাহ আকবর। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) হাদিসে সবগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছেন। প্রথম আসমান সম্পর্কে দুই রকম রেওয়ায়ত আছে।

আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলছেন, প্রথম আসমানটা মওজুন মাগফুফুন। প্রথম

আসমানটা হচ্ছে মওজুন মাগফুফুন, পানি দিয়ে তৈরি। পানি।। এজন্য পানি যখন

দূরের থেকে দেখা যায় তখন কি দেখা যায়? নীল দেখা যায়। আমরা যখন প্লেনে চড়ি, সাগরের উপর দিয়ে যখন প্লেনগুলো যায়, নিচে কি দেখা যায়? নীল (রঙ)

দেখা যায়। নীল আকাশের মতই দেখা যায়। এজন্য প্রথম আসমান পানি দিয়ে

তৈরি, বরফ হতে পারে। আরেক রেওয়ায়ত আসছে, 'মিন জুজাজাতিন', কাচের

তৈরি।

প্রথম আসমানটা? কাচের তৈরি। এই প্রথম আসমান পর্যন্ত গিয়ে আল্লাহর  
রাসূল(সা) থামলেন।"

শায়খ জসীমউদ্দিন রাহমানি(হাফিঃ)

অডিও বক্তব্য শুনুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=Df-kNCxUOz8>

২:১৩ মিনিট থেকে।

[উল্লেখ্য, শায়খ জসীমউদ্দিন রাহমানি (হাফি) এর সাথে আটকৈলটির মূল বক্তব্য ও  
বৃহত্তর দিক দিয়ে অত্র গ্রুপ বা কমিউনিটিতে প্রকাশিত ননরিলিজিয়াস কোন তথ্যের  
ব্যপারে বিশ্বাসগত সংশ্লিষ্টতা নেই]

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখছেন বলা হচ্ছে আকাশ বলতে সীমাহীন শূন্যতা নয় বরং

এক সমুন্নত তরঙ্গায়িত পানি/কাচের ছাদকে বোঝায়। আর লুনার ওয়েভ  
ফেনোমেনন এসকল ইসলাম ভিত্তিক অদৃশ্যজগতের তথ্যকে সত্যায়ন করতঃ

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

দুর্বল বর্ননার হাদিসগুলোতে আসমানের যে তরঙ্গ বা উর্মিমালার বর্ননা পাওয়া

যাচ্ছে, সেটাকে আমরা রিয়েলিটিতেই স্পষ্টভাবে ক্যামেরার ফ্রেমে দেখছি।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, টেউ লিকুইড বা পানি সংশ্লিষ্ট মাধ্যমেই সাধারণত দেখা যায়

যা চাদের মৃদু আলোয় চন্দ্রপৃষ্ঠে শক্তিশালী জুমলেন্সের বদৌলতে দেখা যাচ্ছে, যা

আসমানে প্রবহমান।

হেনেসী কমার্শিয়ালে চমৎকার ভিডিওটির লিংক না দিলেই নয়, যেখানে আসমানকে পানিপূর্ণ ছাদ হিসেবে দেখানো হয়েছে যা মেইনস্ট্রিম কসমোলজি ও সাইন্টিফিক

তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=30xqqjosCLQ>

কাফেররা কুফরি করতেই পছন্দ করে। এজন্য তারা ভিডিও কমার্শিয়ালটির ০.৪৬ সেকেন্ডে দেখিয়েছে যে আকাশভেদ করে অন্যত্র বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অথচ আল্লাহ বলেন,

"হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না"(৫৫:৩৩)

[আয়াতটি কিয়ামত পরবর্তী বিচার দিবসকে নির্দেশ করে, যার জন্য সন্দেহবাদী মোডারেট ইসলামিস্টরা বলে, 'এরূপ এনক্লোজড ব্যবস্থাপনা বিচার দিবসের জন্য শুধু প্রযোজ্য', এজন্য তারা আউটার স্পেস-হেলিওসেন্ট্রিক বিলিফকে ইসলাম দ্বারা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বিজ্ঞানকে ঠিক রাখতে গিয়ে বস্তুত ভ্রান্তির জালে আটকা পড়ছেন।

যেহেতু আল্লাহ বলেন,"

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত

কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই

হবে"(২১:১০৪)। অর্থাৎ কিয়ামতে সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বিচার দিবসে তিনি

আবারো একইভাবে প্রথমবারের ন্যায় সৃষ্টি করবেন। যেহেতু সূরা আর রহমানের ৩৩ নং আয়াতে বিচার দিবসে পালিয়ে আসমান, যমীন ভেদ করে যাবার পথ নেই বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, এবং এখানে সূরা ২১ এর ১০৪ নং আয়াতে পুনরায় কিয়ামত পূর্বের ন্যায় একইভাবে সৃষ্টি করবেন বলেছেন, সেহেতু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কিয়ামতপূর্বেও আসমানজমিন এনক্লোজড ছিল যার একই পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে বিচারদিবসে। অতএব বুঝতেই পারছেন, মোডারেট ইসলামিস্টরা মিথ্যাকে শুদ্ধ করতে গিয়ে আরো বড় গলদ করে বসছে]

আমরা ইতোপূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে আসমান পানি বা স্ফটিকের ছাদ। নিচের আয়াতে চাঁদ সূর্যের ব্যপারে সাতার কাটার বিষয়টি পুরো ব্যাপারটির তথ্যশিকলকে আরো শক্তিশালী করে।

**আল্লাহ বলেনঃ**

**"সূর্যের পক্ষে সম্ভব না চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে"(৩৬:৪০)**

এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক যে, চাঁদ সূর্য পানিপূর্ণ আসমানে সন্তরনরত। এরূপ হলে পূর্ববর্তী প্রতিটি দলিল ও বাস্তবজগতের ফেনোমেনার পারস্পারিক হার্মোনি তৈরি হবে। আর কুরআনের এই আয়াতের আক্ষরিক অর্থটি একদমই কন্ট্রাডিক্ট করেনা রিয়েলিটিতে।

এরূপ ধারণা করা হচ্ছে যে গোটা পৃথিবী-আসমানকে পানি ঘিরে রেখেছে

দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=Q-SlysdKk7Y>

<https://m.youtube.com/watch?v=xMp49IYBhO4>

জনৈক প্রফেসর সাবমেরিনে করে সমুদ্রপৃষ্ঠে গিয়ে এক অদ্ভুত আন্ডারওয়াটার

লেকের সন্ধান পেয়েছেন, যা ভেদ করে নিচে যাওয়া যায় না।। উলটো

সাবমেরিনকে ধাক্কা দিয়ে উপরের দিকে ঠেলে দেয়।

খুব সম্ভবত আসমানও ঠিক একই ভাবে জমাট পানির প্রাচীর স্বরূপ অর্থাৎ হাদিসে

উল্লিখিত 'জমাট ঢেউ/তরঙ্গ'। দেখুন-

[https://m.youtube.com/watch?v=NEVW\\_9EVjFE](https://m.youtube.com/watch?v=NEVW_9EVjFE)

তারকারাজির মিটিমিটি প্রজ্বালনও বলে দেয় আসমান পানি দ্বারা পরিপূর্ণ। ইতোপূর্বে  
বিস্তারিত আটিকেল প্রকাশ করেছি যে বিষয়ে যে নক্ষত্ররাজির মধ্যে গ্রহ বলতে যা

বোঝায় তার অস্তিত্ব নেই। বরং সবই আসমানে গাথা বাতিস্বরূপ(তাফসীর ইবনে

কাসিরেও এরূপ এসেছে যে আসমানে নক্ষত্রসমূহ গাঁথা)। আর ক্লোজআপ

ফুটেজেও সবগুলোকে প্রবল কম্পনের সাথে মিটিমিটি জ্বলতে দেখা যায়, যেমনি

আমরা খালি চোখেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। কখনো পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়ে

সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? সূর্য ওই অবস্থায় ঐরূপ দেখতে যেমনটি

তারকাদের দেখা যায়। অর্থাৎ অবশ্যই একটা পানির স্তরের নিচে থেকে আলোকে

যেমনি দেখায় তারকারা ঐরূপ। দেখুন-

[https://m.youtube.com/watch?v=kmO2IKFiN\\_Q](https://m.youtube.com/watch?v=kmO2IKFiN_Q)

ক'দিন আগে নিচে প্রদত্ত লিংকের ফুটেজটি দেখে বিস্মিত হই। একটি রকেট আসমান পানে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আকাশে প্রবল ঢেউ সৃষ্টিপূর্বক থেমে যায় অথবা রকেটটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভিডিওটি দেখলে এরূপ মনে হবে যেন রকেটটি লিকুইড কোন স্তরে আছড়ে পড়েছে।

রিপল গুলোকে গভীরভাবে দেখলে বুঝবেন এটাকে বিস্ফোরণ পরবর্তী শকওয়েভ বলা যায় না। কারণ একটি বিস্ফোরণ পরবর্তী শকওয়েভ প্রধানত একটি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু ভিডিওটিতে রকেটটির বিস্ফোরণ পরবর্তীতে উদ্ভূত রিপল বা তরঙ্গ/ঢেউ শকওয়েভ থেকে একদম ভিন্ন। বরং এই ঢেউ একদম পানির ন্যায়। তবে অত্যন্ত ঘন লিকুইডের। পানিতে কিছু পতনে যেমনি একাধিক রিপল তৈরি হয়। যেন সত্যিই পানিতে ভারী কিছু আছড়ে পড়েছে। হাত থেকে ছোট পাথর কনা স্থির জলাশয়ে ফেললে এরকম একাধিক রিপল ইফেক্ট তৈরি হয়। তবে আসমানের এই পানির সার্ফেসটেনশন অত্যন্ত শক্তিশালী অনেকটা দুর্ভেদ্য। আল্লাহ্ আলাম হয়ত রকেটটি পানির তৈরি মজবুত সুউচ্চ ছাদেই আছড়ে পড়ে। দেখুন-  
<https://m.youtube.com/watch?v=rp7IYL-4PfE>

এবার দেখুন বেলুন যেন আসমানে স্ফাচ করছে। শব্দও যেন তাই। কিছু একটা এটাকে আর উপরে যেতে দিচ্ছে না। যেন ক্যামেরাসমেত বেলুন ইনভিজিবল কোন শিল্ডে বারবার ঘর্ষিত হচ্ছে। দেখুনঃ  
<https://m.youtube.com/watch?v=IF3aTc95PFE>

উপোরোল্লিখিত হাদিসে

দু রকম বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। ১. আসমান পানির তৈরি, ২. কাচের তৈরি। এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে আসমানের প্রথম আবরণটি স্ফটিক কাচ জাতীয় কিছু দ্বারা নির্মিত, এবং উপরে পানি দ্বারা পূর্ণ। যেমনটা কাফেররা বিদ্রূপ করে দেখিয়েছে

সিম্পসন কার্টুনে। দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=s1hD8c--BKO>

অতএব দেখা যাচ্ছে হাদিস গুলোর মধ্যে সাংঘর্ষিকতা নেই, জ্ঞানগতসীমাবদ্ধতার জন্যই আমরা আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছুতে কন্ট্রাডিকশন খুজে পাই।

এবার রিয়েলিটিতে আসুন। স্কাই স্টোনের নাম শুনেছেন? নীলাভ রহস্যময় অদ্ভুত পাথর। এর নাম দেওয়া হয়েছে আসমানী পাথর বা স্কাই স্টোন।

আফ্রিকার একটি দেশে এর সর্বপ্রথম দেখা মেলে। কিছু গবেষক এটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে গবেষণায়। তারা এ পাথর বা স্ফটিক বিশ্লেষণে ৭৭% অক্সিজেন পান! ৭৭ সংখ্যাটা ইন্টারেস্টিং বিশেষ কারনে। যাহোক, অন্য একটি অজানা পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে যা দুনিয়াতে কখনো পাওয়া যায় নি। গবেষকরা ওই পদার্থের ব্যপারে কিছুই জানেন না। এ ব্যপারে বিস্তারিত দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=S2UU1ozBmm0>

এসব অদ্ভুত তথ্য গলাধঃকরণের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা অন্যখানে।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের মাথায় 'আউটা স্পেস, ইনফিনিট এভার



এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স এবং মহাশূন্য- আসমান মানেই শূন্য' ইত্যাদি তথ্য অনেকটা রিড অনলি মেমরির স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। আমরা আজ এতই ব্রেইনওয়াশড এবং থটলেস যে কল্পনাই করতে পারি না আসমান ছাদের ন্যায় কিছু। এরূপ ব্রেইনওয়াশিং এর ক্রেডিট পাবার যোগ্য হলিউড আর টিভি। কেন সেটা ভাল করেই জানেন। বই পত্র যতটা না মনে দাগ কাটতে পারে, তার চেয়েও গভীর দাগ কাটে, মুভি আর ভিডিও। ওরা যা দেখায় তার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান প্রতিপালক তার প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাবে স্পষ্টভাবে বলেনঃ

الْمَرْفُوعِ وَالسَّقْفِ

এবং[শপথ] সমুন্নত ছাদের,(আত ত্বুরঃ৫)

সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতে বর্ণনা করছেনঃ

"যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে..."

আল্লাহ বলেনঃ

مُعْرَضُونَ آيَاتِهَا عَنْ وَهُمْ مَحْفُوظًا سَقْفًا السَّمَاءِ وَجَعَلْنَا

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২১:৩২]

সূর্যকেন্দ্রিক বিজ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব আকাশ শূন্য/অসীম, কিন্তু বাস্তবে তা নয় বরং তা ত্রুটি(ফাটল/ছিদ্র)হীন সলিড স্তম্ভবিহীন মজবুত ছাদঃ

---

আল্লাহ বলেন

شِدَادًا سَبْعًا فَوْقَكُمْ وَبَيْنَنَا

নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ। [সূরা  
নাবাঃ১২]

আল্লাহ বলেনঃ

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ  
তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও;  
কোন ফাটল দেখতে পাও কি?" [সূরা মুলকঃ৩]

আল্লাহ বলেন:

"তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি  
কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও  
নেই" [সূরা ক্বাফ ৬]

আল্লাহ বলেনঃ

"আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ  
ব্যতীত। (রাদঃ২)

আকাশের নিশ্ছিদ্রতা ও ফাটলহীনতার বর্ণনা এটা প্রমানের জন্য যথেষ্ট যে আকাশ  
সলিড ছাদ বিশেষ। স্তম্ভকে সাধারণত সলিড কিছুকে ধারন করতে ব্যবহার করা

হয়, আল্লাহ আকাশকে স্তম্ভের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

আকাশ 'ভঙ্গুর, মজবুত, নিরেট ছাদ' কিনা এ বিষয়ে বিদ্যমান সংশয় সম্পূর্ণভাবে দূর করে নিম্ন উল্লিখিত আয়াতেঃ

---

আল্লাহ বলেনঃ

"..তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে\_পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান" (সূরা হাজ্জ্ব ৬৫)

মানুষের প্রতি করুণাশীল সৃষ্টিকর্তা দুনিয়ার ছাদকে স্থির অবস্থায় রাখেন যেন তা পৃথিবীর উপরে ভেঙ্গে না পড়ে, যেহেতু এই মহাছাদের কোন স্তম্ভ নেই। নিশ্চয়ই এটা অকাট্য দলিল যে আকাশ সলীড/নিরেট ছাদবিশেষ।

আল্লাহ বলেনঃ

"তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব

অথবা আকাশের\_কোন\_খন্ড\_তাদের\_উপর\_পতিত করব। আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা সাবা ৯)

আল্লাহ এখানে আকাশের খন্ডাংশের পতনের কথা এনে আরো ভালভাবে ক্ল্যারিফাই করেছেন। আর এ বিষয়টি অনুধাবনের মধ্যে আল্লাহ্‌ভিমুখী বান্দাদের

নিদর্শন আছে। বস্তুত আসমান ছাদ বিশেষ, যদিও মোডারেট মুসলিমরা  
কাফেরদের সাথে গলা মিলিয়ে উল্টোটা বলতেই পছন্দ করে।

আল্লাহ বলেনঃ

আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ  
তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের  
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম  
করুণাময়।(সূরা শূরা ০৫)

একমাত্র আকাশ হিসেবে সলিড ছাদই ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হতে পারে,  
মহাশূন্যের অস্পৃশ্য আকাশ নয়।

আল্লাহ বলেনঃ

তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে এটা তো  
পুঞ্জীভূত মেঘ।(সূরা আত ত্বুর ৪৪)

আকাশের কোন অংশ ভেঙ্গে পড়ার এই আয়াত জিওসেন্ট্রিক নোশনকে শক্তিশালী  
থেকে আরও শক্তিশালী করে।

আল্লাহ বলেনঃ

অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনভাবে আমাদের উপর  
আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও

ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।(সূরা বনী  
ইসরাইলঃ৯২)

ওইযুগের কাফেররাও আসমানের ব্যপারে জিওসেন্ট্রিক মডেলকে স্বীকার করত।

আল্লাহ বলেনঃ

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি  
এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি  
সহনশীল, ক্ষমাশীল।(সূরা ফাতিরঃ৪১)

বিজ্ঞান আমাদের বলে গোলাকৃতি পৃথিবী প্রচন্ড গতিতে নিজে তো ঘুরছেই সাথে  
সূর্যের চারদিকেও ঘুরছে এমনকি সেটা সূর্যসমেত অসীমতার দিকে ধাবমান। বস্তুত  
এসব অপ্রমাণিত মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তো ঐ ভ্রান্ত বিজ্ঞানের ঠিক  
বিপরীতটাই বললেন যে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের শিক্ষা ওরা শয়তানের কাছে থেকে লাভ  
করেছে।নিশ্চয়ই পৃথিবী ও আকাশ স্থির।

অধিকন্তু মহান পালনকর্তা এখানে আকাশকে স্থির রাখবারও কথা আলাদাভাবে  
বলেছেন। যারা শয়তানের পূজারীদের দেখানো অস্পৃশ্য আসমানে বিশ্বাসী তাদের  
নিকট প্রশ্ন, সীমাহীন মহাশূন্যকে আবার স্থির রাখতে বা ভারসাম্য ঠিক রাখার মানে  
কি! সেটা সলিড স্ট্রাকচার না হলে এরকম কথা একদমই অবৈজ্ঞানিক!

আকাশের নিরেটত্ব(solidness) এর প্রমাণ কিয়ামত সংক্রান্ত আয়াতেঃ

আল্লাহ বলেনঃ

مَوْزًا السَّمَاءِ تَمُورُ يَوْمَ

সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।(সূরা ত্বুর ৯)

ভূমিকম্পের ন্যায় আকাশের প্রকম্পন নিরেট আকাশের অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

আল্লাহ বলেনঃ

أَبْوَابًا فَكَانَتْ السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ

আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে(সূরা নাবা ১৯)

আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বহু দরজাবিশিষ্ট হওয়া আসমানের নিরেটভাবেকে সত্যায়ন করে

আল্লাহ বলেনঃ

فُرجَتِ السَّمَاءِ وَإِذَا

যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে(সূরা মুরসালাতঃ৯)

আল্লাহ এখনকার আকাশকে নিশ্ছিদ্র ও ত্রুটিহীন হিসেবে কিয়ামতের সময়ে

বিপরীতটা ঘটবে। যারা আজ বিপরীত তথ্যকে সত্য বলে বসে আছে অর্থাৎ যারা

আকাশের নিরেট অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারা সত্যিই বিস্মিত হবে।

সূরা হাককাহ, আয়াত ১৬

"এবং আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে ।"

সূরা রহমান, আয়াত ৩৭

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন ওটা লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ করবে;"

সূরা মাআরিজ, আয়াত ০৮

"সেদিন আকাশ হবে গলিত রূপার মত,"

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে'(21:104)

"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে"।(সূরা যুমার ৬৭)

আকাশ নিরেট/ সলিড ছাদ বিশেষ যা অবশেষে কাগজের ন্যায় গুটিয়ে নেওয়া হবে। অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ! অথচ ওরা এরপরেও মিথ্যাকে প্রমাণ করতে বিতর্ক করতে থাকবে।

তারকারাজি সর্বনিম্ন আসমানেঃ

---

'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।' (সূরা মুলকঃ৫)

হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমিতে তারকারা মহাবিশ্বের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। অথচ সৃষ্টিকর্তা স্পষ্টকরে বর্ণনা করেছেন এসব প্রথম আসমানেই। তারকাদের কিছু সৌন্দর্যের জন্য, কিছু তারকা শয়তান জ্বীনদের বিপক্ষে আকাশের নিরাপত্তা অস্ত্র।

আকাশ থেকে পানিবর্ষণঃ

---

আধুনিক শ্রষ্টাবিমুখ বিজ্ঞান আমাদেরকে পানিচক্রের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটার প্রক্রিয়ার শিক্ষা দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন তিনি আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেন।

আল্লাহ বলেনঃ

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, (যুমার ২১)

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম (মু'মিনুনঃ১৮)

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে



## খবরদার(হাজ্জঃ৬৩)

এছাড়াও

সূরা রুম : আয়াত ২৪, সূরা আল হিজরঃ আয়াত ২২ , সূরা রাদ; আয়াত ১৭, সূরা ফুরকান;  
আয়াত ৪৮, সূরা জাসিয়া; আয়াত ৫

মোডারেটরা ব্যাখ্যা করে, 'আসমান থেকে বৃষ্টিপাত মানে আসমান থেকে নয় বরং কুরআনে তা দ্বারা বৃষ্টিপাতের দিককে বোঝানো হয়েছে!' ওরা তো সমুদ্রত ছাদকেই(আসমান) অস্বীকার করে, যার শপথ করেছেন মহান রব্বুল 'আলামিন সূরা ত্বুরের ৫ নং আয়াতে। সেজন্য আসমান থেকেই যে আল্লাহর তত্ত্বাবধানেই বারিধারা নামে, এটা তারা কস্মিনকালেও স্বীকার করতে চাইবে না। অথচ মহামহিমাম্বিত প্রতিপালক বলেনঃ

مُنْهَمِرٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَبْوَابَ فَتَحْنَا.

তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের  
মাধ্যমে(ক্বামারঃ ১১)

হয়ত অনুভব করতে পারছেন আমরা সম্পূর্ণ উলটা বিশ্বাস পোষন করি, যা সমাজ

**Axiom Truth** হিসাবে শিখিয়েছে। অথবা অন্তরের বক্তার দরুন হয়ত মনে করছেন মেইনস্ট্রিম সাইন্সই শুদ্ধ! কিন্তু হে ভাই, আপনি কি জানেন এই কথিত প্রতিষ্ঠিত মহাকাশ বিদ্যার প্রবক্তারা কারা? কি তাদের বিশ্বাস! তারা তো ছিলেন কালো জাদুবিদ্যার গুহ্যজ্ঞানের আলোকবর্তিকাদের অন্যতম। তাদেরকে মিস্টিক বা

এসোটেরিসিস্ট বলা হয়, আপনি তো জানেন না **Esotericism** অথবা **mysticism** কি বিষয়! আপনার জন্য সহজ হবে বুঝতে, যদি বলি ওরা 'শয়তানের উপাসনাকারী'! পিথাগোরাস, ইওহানেস কেপলার, কোপার্নিকাস, নিউটন... এরা কিসে বিশ্বাসী ছিল? কেউ জানেন কি?

আফসোস.. যখন দেখি আমারই দ্বীনের কোন ভাই এই নিকৃষ্ট কাফেরদেরকে আস্তিক প্রমান করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। ওরা মূলত নাস্তিক্যবাদ রিফিউট করতে গিয়ে তাদেরকে আস্তিক বানিয়ে ফেলে। অথচ ওরা সবাই ছিল ননডুয়ালিস্ট ও মিস্টিসিস্ট। পিথাগোরাস, যিনি গোল পৃথিবীতত্ত্বের জনক, তিনি ছিলেন একজন কালো যাদুকর, মিস্টিক্স, নিউমেরলজিস্ট, স্যাক্রিড জিওমেট্রি আর ম্যাথম্যাটিকস এর দ্বারা জাদুবিদ্যার পার্ফেকশনে কাজ করে যান সারাজীবন। তিনি জাদুবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আনার জন্য কাজ করতেন। আজ বর্তমানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সও অভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। কোপার্নিকাস ছিলেন হার্ম্যাটিসিজম দ্বারা একরকমের পজেসড। সেটা তার প্রকাশিত বইয়ে পাওয়া যায়। চাঁদ সূর্যের এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেসক্রিপশনে পাওয়া যায় গ্রীক হার্মিস ট্রিসম্যাজেস্টিসের প্রশংসা। আপনি কি জানেন **Hermeticism** কি?

এ হচ্ছে পৃথিবীর সকল জাদুবিদ্যার প্রিন্সিপ্যালগুলোর শিকড়। আর নিউটন সাহেব? তিনি ছিলেন একজন ফ্রিম্যাসন। আলকেমি এবং অন্যান্য সিক্রেট ডক্ট্রিন নিয়ে তার সারাজীবন অতিবাহিত হয়, তার অধিকাংশ বইই আনপাবলিশড! ফ্রিম্যাসন অকাল্টিজমের মধ্যে সবচেয়ে ফ্যামিলিয়ার, তাই এসম্পর্কে আপনাদের

প্রশ্ন করতে চাই না। এসব কিছুই ফ্যাক্ট! আপনি কি জানেন, এ যুগের বিজ্ঞানীরাও একই রকম বিশ্বাস মজুদ রাখেন অন্তরে! কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান কালোজাদুবিদ্যাকে 'বিজ্ঞানাইজেশনের' জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। আর বিজ্ঞানীরা সর্বনিকৃষ্ট কুফরের পথেই হাটছে। এই এক ও অভিন্ন অপবিজ্ঞানেও বিশ্বাসকে প্রাচীন আলেমরা বলতেন 'ফেরাউনের চেয়েও বড় কুফরি'। আজ এসবই অনেকের কাছে প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়। আপনি কি জানেন, ফ্রি ম্যাসনিক কিতাব 'মোরাল এন্ড ডগমা'য় বলা হয়েছে, পিথাগোরাস যে এস্ট্রনমির কথা বলেছিল উহা এস্ট্রোনমি নয়, বরং এ্যাস্ট্রলজি।

আফসোস হয় এই লিংকের মত পোস্টগুলো

দেখে- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=17106362.....](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=17106362.....)

যখন দেখি কিছু ভাই নাস্তিকবাদকে ইন্টেলেকচুয়াললিপরাজিত করতে ফেরাউনদের চেয়ে বড় কাফের অর্থাৎ মিচিও কাকুর মত নন ডুয়ালিস্ট মিস্টিক্যাল বিলিফওয়ালাকে 'আস্তিক' বানাতে ব্যস্ত!! আফসোস...ওরা যদি এদের আস্তিকতার স্বরূপ জানত! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। এবার বলুন যে হেলিওসেন্ট্রিজিসম আর স্ফেরিক্যাল আর্থের জন্মস্থানটাই পচা আর সম্পূর্ণ স্যাটানিক, সেখান থেকে কোন সেন্সে কথা গ্রহন করবেন এবং বিশ্বাসের আসনে বসাবেন! /?

অতঃপর জেনে রাখুন মিথ্যাবাদী, অন্তরে ব্যাধিগ্রস্তরা মিথ্যা প্রচার করেই যাবে।

অতএব, সত্যান্বেষণ করুন অতঃপর নিজেকে আপন পালনকর্তার দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিন।


ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ | (AMSBD)

### ইসলামের দৃষ্টিতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিঃ

#### বজ্রপাতের মূল কারণঃ

মেঘের গর্জন ও বজ্রপাত প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মহান আল্লাহ তাআলা প্রকৃতির এ নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বজ্র-নিাদের মাধ্যমে প্রকৃতি মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য, তাঁর পরিপূর্ণতা ও মহিমা বর্ণনা করে থাকে। এছাড়াও মেঘমালা সৃষ্টি ও বৃষ্টিপাত ঘটানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা মেঘের গর্জনের সৃষ্ট আতঙ্কে আরো বেশি আল্লাহর মহিমা ও গুণকীর্তন করেন। বজ্রপাতের প্রচণ্ড গর্জন এবং আলোর ঝলকানি মহান আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির বহিঃপ্রকাশ। বজ্রপাতের গর্জন ও আলোর ঝলকানি মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সতর্কবাণী।

• বজ্রপাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বান্দাদের সাবধান করার জন্য বর্ষণ করে থাকেন। তিনি চাইলে এ বজ্রপাতের মাধ্যমে তাঁর অবাধ্য সীমালংঘনকারী বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

•  মহান আল্লাহ তাআলা বজ্রপাত প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ করেন, ‘মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত

হয়ে তাসবিহ পাঠ করে; তিনি বজ্রপাত করেন এবং (অনেক সময়) তাকে যার ওপর চান, ঠিক সে যখন আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত তখনই নিক্ষেপ করেন। অথচ আল্লাহ তাআলার শক্তি কৌশল ও শক্তি বড়ই জবরদস্তা’ (সূরা রা’দ : আয়াত ১৩) পথহারা মানুষের জন্য মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎচমক শিক্ষণীয় বিষয়। কারণ মেঘের গর্জন এ কথা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ তাআলা যে বায়ু পরিচালিত করেন, বাষ্প ও মেঘমালাকে একত্র করেন। এ বিদ্যুৎকে বৃষ্টির মাধ্যম বা উপলক্ষ বানান এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকূলের জন্য তিনি পানির ব্যবস্থা করেন। তিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি-অভাব মুক্ত। তিনি জ্ঞান ও শক্তির দিক থেকে পূর্ণতার অধিকারী। পশুর মতো নির্বোধ শ্রবণ শক্তির অধিকারী তো এ মেঘের মধ্যে শুধুই গর্জনই শুনতে পায় কিন্তু বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সজাগ শ্রবণ শক্তির অধিকারী ব্যক্তির মেঘের গর্জনের মধ্যে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নির্দশন দেখতে পান।

আরবের মুশরিকরা আল্লাহর উপাসনা বাদ দিয়ে ফেরেশতাদেরকেও দেবতা হিসেবে গণ্য করতো। মানুষের আল্লাহদ্রোহীতা ও জুলুম-অত্যাচার, জ্বিনা-ব্যভিচারসহ যাবতীয় মনবতা বিবর্জিত অন্যায় কাজেই এ বজ্রপাতের মূল কারণ।

🌟 হাদিসে এসেছে, ‘হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দারা যদি আমার বিধান যথাযথ মেনে চলত, তবে আমি তাদেরকে রাতের বেলায় বৃষ্টি দিতাম আর সকাল বেলায় সূর্য (আলো) দিতাম এবং কখনও তাদেরকে বজ্রপাতের আওয়াজ শুনাতাম না।’ (মুসনাদে আহমদ)

কুরআন এবং হাদিসের বর্ণনায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, বজ্রপাত পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক মহা দুর্যোগ। আল্লাহ প্রদত্ত এ দুর্যোগ থেকে বেঁচে থাকতে হলে কুরআন হাদিসের নির্দেশ পালনের বিকল্প নেই।

পত্র-পত্রিকায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, কোথাও না কোথাও বজ্রপাতে প্রাণহানি ঘটেছে। আবার একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে। যা মানুষের জন্য তাদের অবাধ্যতার সতর্কবাণী। কুরআনের বিধান পালন এবং প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো তাসবিহ ও দোয়া পাঠে বজ্রপাতের দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বজ্রপাতসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষায় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতদের বিভিন্ন দোয়া ও তাসবিহ শিখিয়েছেন।

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছেঃ---

🌟 হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথাবার্তা ছেড়ে দিতেন এবং এ আয়াত পাঠ করতেন-

অর্থ : আমি সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার পবিত্র ঘোষণা করছে মেঘের গর্জন ; তাঁর প্রশংসার সাথে আর ফেরেশতাকুল প্রশংসা করে ভয়ের সাথে (মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত)

## বৃষ্টিঃ

বৃষ্টি আল্লাহর রহমতের নিদর্শন। কিন্তু কখনো আবার বৃষ্টি আজাবেও রূপ নিতে পারে। বৃষ্টির কারণে ও প্রাকৃতিক বৈরিতার কারণে অনেকে কষ্টে পড়তে পারেন। নানা ধরনের অসুবিধাও তৈরি হতে পারে।

•  
🌟 আয়েশা (রা.) বলেন, যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতো এবং ঝোড়ো বাতাস বইত— তখন রাসুল (সা.) এর চেহারা চিন্তার রেখা ফুটে উঠত। এই অবস্থা দেখে তিনি এদিক-সেদিক পায়চারি করতে থাকতেন এবং এ দোয়া পড়তে থাকতেন,  
‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা-ফিহা ওয়া খাইরা মা-উরসিলাত

বিহি, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা-ফিহা ওয়া শাররি মা-উরসিলাত বিহি।’ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এ বৃষ্টির মাধ্যমে প্রেরিত সমূহ কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আর এ বৃষ্টির মাধ্যমে প্রেরিত সমূহ বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ চাই।’ এরপর যখন বৃষ্টি হতো তখন মহানবী (সা.) শান্ত হতেন।

আয়েশা (রা.) আরো বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে লোকজন মেঘ দেখলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়ে থাকে, আর আপনি তা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন?’ এর জবাবে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমি এ ভেবে শঙ্কিত হই যে বৃষ্টি আমার উম্মতের ওপর আজাব হিসেবে পতিত হয় কি না। কেননা আগের উম্মতদের ওপর এ পদ্ধতিতে (বৃষ্টি বর্ষণের আকারে) আজাব পতিত হয়েছিল।’ (মুসলিম, হাদিস নং : ৮৯৯)

তাই ঈমানদারদের উচিত, আকাশে বৃষ্টির ভাব দেখলে উল্লিখিত দোয়া পাঠ করা।

### ● বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ঃ

অন্যদিকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে মহানবী (সা.) একটি বিশেষ দোয়া পড়তেন। এ দোয়া পাঠ করা হলে ইনশাআল্লাহ বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

🌱 আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন বজ্রের আওয়াজ শুনতেন তখন এ দোয়া পড়তেন, ‘আল্লাহুম্মা লা-তাক্বতুলনা বিগাজাবিকা ওয়া লা-তুহলিকনা বিআজা-বিকা ওয়া আ-ফিনা-ক্ববলা জা-লিকা।’ অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার গজব দিয়ে হত্যা করে দেবেন না এবং আপনার আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন না। এসবের আগেই আপনি আমাকে পরিত্রাণ দিন। (তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৪৫০)

🌱 আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল (সা.) বজ্রপাতের শব্দ শুনলেই পড়তেন, ‘সুবহানাল্লাজি ইয়ুসাব্বিহুর রা‘অদু বিহামদিহি।’ অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

ইবনে আবি জাকারিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বজ্রের আওয়াজ শুনে এ দোয়া পড়বে, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’, সে বজ্রে আঘাতপ্রাপ্ত হবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ২৯২১৩)

🌟 ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও বুখারী (র) কিতাবুল আদবে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে হাজ্জাজ ইবনে আর্তা (র) বর্ণিত সালিমের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বজ্রধনি শুনতেন তখন বলতেন: “হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি তোমার গজব দ্বারা বধ করো না ও তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করো না এবং এর আগেই তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করো.”

### ● কিছু অজানা ও ব্যতিক্রমী তথ্যঃ

ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র) যথাক্রমে ইয়াজিদ ইবনে হারুন, ইব্রাহীম ইবনে সাদ ও সাদ সূত্রে গিফার গোত্রের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ মেঘ সৃষ্টি করেন, ফলে তা উত্তমভাবে কথা বলে ও উত্তম হাসি হাসে।

মুসা ইবনে উবায়দা ইবনে সাদ ইব্রাহীম (র) বলেন, “মেঘের কথা বলা হলো বজ্র আর হাসি হলো বিজলী “.

ইবনে আবু হাতিম বর্ণনা করেন যে, মুহম্মদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আল-বার্ক এমন একজন ফেরেশতা, যার চারটি মুখ আছে, মানুষের মুখ, ষাঁড়ের মুখ, শকুনের মুখ ও সিংহের মুখ. সে তার লেজ নাড়া দিলেই তা থেকে বিজলি সৃষ্টি হয়.

ইবনে জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বজ্রের আওয়াজ শুনলে বলতেন: “পবিত্র সেই মহান সত্তা, বজ্র যার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে”.



মালিক আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বজ্রের আওয়াজ শুনলে কথা-বার্তা ত্যাগ করে বলতেন: পবিত্র সেই সত্তা, বজ্র ও ফেরেস্তাগণ সভয়ে যার প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি আরও বলতেন: নিশ্চয়ই এটা পৃথিবীবাসীর জন্য এক কঠোর হুঁশিয়ারি।

তথ্যসূত্রঃ হাফিজ ইবনে কাছীর প্রণীত "আল-বিদায়া ওয়ান -নিহায়া" কিতাবা (প্রথম খন্ড)

### ● আরেকটি আশ্চর্য তথ্য:

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে রা'দ (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন, এটা কি? তিনি বললেনঃ মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুকা। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাঁকডাক। এভাবে হাঁকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি আমাদের বলুন, ইসরাঈল [ইয়াকুব ('আঃ)] কোন জিনিষ নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তিনি ইরকুন নিসা (স্যায়াটিকা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু উটের গোশত ও এর দুধ ছাড়া তার উপযোগী খাদ্য ছিল না। তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

[জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩১১৭]

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস]

কি ভাই? মাথা ঘুরছে?

.  
বিজ্ঞান যেন কি কি বলে এসব বজ্রপাত-বিদ্যুৎ নিয়ে?

সেসব গিলে বড় হওয়া পাবলিক ইসলামের সাথে বিজ্ঞানকে মিশিয়ে "ওয়াও, ইসলামে ১৪০০ বছর আগেই এটা এসেছে" বলে উল্লসিত হয়। অথচ দেখুন দেখুন ইসলাম কি বলে বজ্র সম্পর্কে "!"

.  
বস্তুত, ইসলামে যা আছে তাই বিশ্বাস করতে হবে, এটাকেই বলে ঈমান। ঐ বিজ্ঞান প্রমাণ করলে বা হাবিজাবি গাজাখোরি থিওরি দিলে তার সাথে ভুংচুং মিশিয়ে হিরো বনে ইসলামকে জাস্টিফাই করতে যাওয়াটা নিরেট মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইসলাম কারো প্রমাণের উপর নির্ভরশীল না, ইসলাম যা বলে তাই ১০০% সত্য, বিজ্ঞানের মানা-না মানায় কিছুই যায় আসে না।

### ●পারিশেষেঃ

মেঘের গর্জন তথা বজ্রপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্ত থাকতে আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে চলা জরুরি। পাশাপাশি বজ্রপাতের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকতে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়া ও তাসবিহগুলো পড়া উচিত।

.  
আর বিজ্ঞান দ্বারা ইসলাম মাপা বন্ধ করুন! দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়, ইসলাম স্বতন্ত্র, ইসলাম দিয়ে সবকিছু যাচাই করে দেখতে হয়, বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে মাপা যাবে না।

.

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মেঘের গর্জন তথা বজ্রপাতের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা, সব ধরনের অন্যায় ও অবাধ্য আচরণ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার এবং তার বিধান পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

### **সমতল ও স্থির পৃথিবীতে ঋতুবৈচিত্র্য কিভাবে হয়:**

প্রথমে দুই ভাইয়ের দুটি বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তারপর আরো কিছু কথা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

#### **বক্তব্য-১:**

ঋতু পরিবর্তন ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যার ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই। প্রাচীন আলিম মুফাসসীরীন এমনকি সাহাবিদের জামায়াত এ সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা তলব করেন নি, আমরাও করিনা। ব্যাখ্যা না করলেই যে অসত্য হবে এমনটাও তাদের শিক্ষা ছিল না। মূলত তারা এসব শুনেই বিশ্বাস করতেন বিনা যুক্তিতে। শুনলাম ও মানলাম। আমরাও এর দিকে উৎসাহিত করি। সমতল বিশ্বব্যবস্থায় পশ্চিমা কাফিরদের ভাসনে সবকিছুরই মোটামুটি যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। আমরা সেদিকে যাইনা। আগ্রহও নেই। তাছাড়া ওদের দেখানো জগতটি ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না। তাই, আপনার যদি খুব কৌতূহল হয় আপনি এসব নিয়ে সময় ব্যয় করতে পারেন(যদিও এ মুহুর্তে এসবে সময় দেয়াকে অসমর্থন করি), নিজের মত লজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশান দাড় করাতে পারেন। কাফিরদের ভাসনের সমতল

যমীনকেও ব্যবহার করতে পারেন সবকিছুর ব্যাখ্যা করার জন্য। ইতোমধ্যে তারা সমতল যমীনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ইলেক্ট্রম্যাগনেটিজম সহ অনেক তত্ত্ব তৈরি করেছে নিজেদের উদ্যোগে। আপনি অতি কৌতূহলী হলে সেসবে প্রবেশ করতে পারেন। সমতল কিংবা বর্তুলাকার ব্যপার না, অতীতের দার্শনিকদের পছন্দের ভেদ হয়েছে ফিলসফিক্যাল ফাউন্ডেশন অনুযায়ী। এরপর সবকিছুর মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে গানিতিক শুদ্ধতা সহ! এটা আইনস্টাইনও বলেন।

উপরের বক্তব্যটি সম্ভবত ইমরান ভাইয়ের। আমার ঠিক মনে নেই। অনেক আগে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। ওই কথা গুলোই ঠিক। সব কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। তারপরেও মুমিনদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য কোনো কোনো ভাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। নিচে এমনি আরেক ভাইয়ের বক্তব্য দেয়া হলো।

## বক্তব্য-২:

সহজ উপস্থাপনঃ

সূর্যের গতি দু'ধরণের।

১- দৈনিক গতিঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ২৪ ঘন্টায় এক চক্র সম্পন্ন করে। এর ফলে সকাল, দুপুর ও বিকাল হয়। সকালে সূর্য আপনার দিকে আসতে থাকে, ভর দুপুরে আপনার সর্বাধিক কাছে থাকে। তারপর আবার দূরে সরে যেতে যেতে আপনার

দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়, এভাবে তার চক্র সম্পন্ন করে অন্তর্মিত হয় ও

আল্লাহকে সেজদা করে। তারপর আবার উদ্ভিত হয়।

২- বাৎসরিক গতিঃ অক্ষরেখায় চলতে চলতে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ও উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যে গতি বিদ্যমান তাকে বাৎসরিক গতি বলে। প্রতিটি

অক্ষরেখায় সূর্য প্রায় ৩মাস অবস্থান করে। ১ম অক্ষ থেকে ৩য় অক্ষে আসতে ৬মাস লাগে; তারপর আবার ৩য় অক্ষরেখা থেকে ১ম অক্ষরেখায় ফিরে যেতে লাগে ৬মাস। এভাবে একবছর পূর্ণ হয় ও ঋতুবৈচিত্র দেখা দেয়। আল্লাহ অধিক অবগত...



**R:M:** বলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী তত্ত্বে কাফেররা সত্য মিথ্যা মিলিয়ে সব ব্যাখ্যা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তারপরেও যথাসাধক চেষ্টা করেছি।

এছাড়াও আমরা নিচের এই হাদীসটি থেকে শীত ও গ্রীষ্মের পরিবর্তনের ধারণাটিও নিতে পারি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু’টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালো। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাকা’

হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব ৮ম খন্ডের এই অংশটুকুও পড়ুন:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা নিম্নতম আসমানে চাঁদ ও সূর্যের জন্য কক্ষপথ নির্ধারন করেছেন। আসমানী সমুদ্রের কক্ষপথে চাঁদ ও সূর্যের জন্য ৩৬০ জন করে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন যারা চাঁদ সূর্যকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ সমতল পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে ১৮০টি করে উত্তপ্ত কালো পানির জলাশয় তৈরি করেছেন, চাঁদ সূর্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্তগমন করে, তেমনি ১৮০টির মধ্যে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উদিত হয়। শীত ও গ্রীষ্মে উদয়াচল ও অস্তাচলে সূর্যের উদয় অস্তের স্থান পরিবর্তন করে, এতে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে কমে। এজন্য আল্লাহ বলেনঃ

**"তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।"**

**(আর রহমান; আয়াত ১৭)**

"আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয় আমি সক্ষম।"

(আল মা'আরিজ; আয়াত ৪০)

অন্য একটি ব্লগের আলোচনা থেকে (লিখেছেনঃ শেখ সা'দী) আরো সহজ করে বুঝে নিব।

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

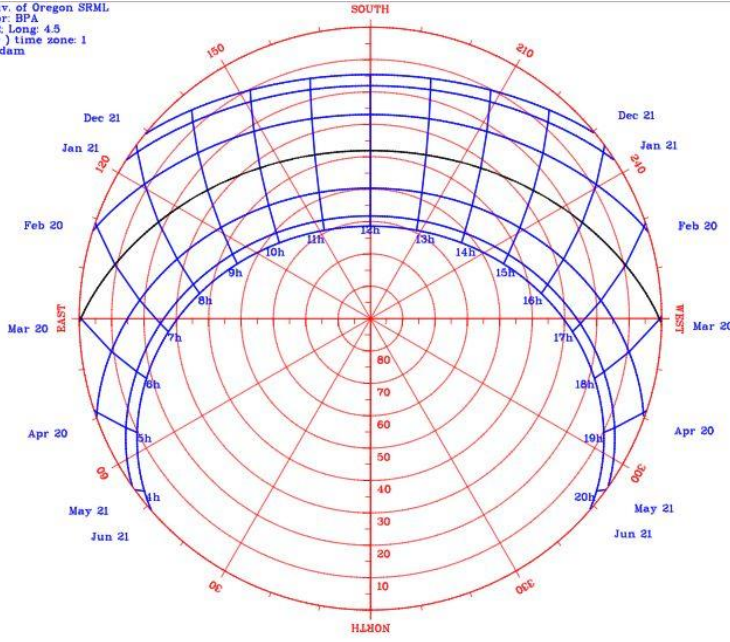
অর্থঃ “তিনি দুই ‘মাশরিক’ ও দুই ‘মাগরিব’ এর প্রভু”

(আল কুরআন, আর রহমান ৫৫ : ১৭)

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেন শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে। বছরের প্রত্যেক দিনই সূর্য আকাশে ভিন্ন ভিন্ন কোণ (angle) তৈরি করে উদিত ও অস্তমিত হয়। গ্রীষ্ম ও শীতে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলের কোণে (angle) সবচেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যায়। আয়াতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বছর জুড়ে সূর্যের গতিপথ কেমন হয় তা নিচের ফিগারে (প্রদত্ত ছবি) দেখে নিতে পারেন।



(c) Univ. of Oregon SRML  
Sponsor: BPA  
Lat: 52, Long: 4.5  
(Solar) time zone: 1  
Rotterdam



চিত্রে লাল বৃত্ত দিয়ে কোণ (angle) নির্দেশ করা হচ্ছে। সবার বাইরের বৃত্তে ডিগ্রিতে কোণের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর নীল রেখাগুলো হচ্ছে সূর্যের সারাদিনের গতিপথ। নীল দাগগুলোর উপর লম্বা লম্বা ছোট কিছু দাগ রয়েছে। এগুলো দিনের বিভিন্ন ঘণ্টা নির্দেশ করে। বছরের ৬টি দিনে সূর্যের গতিপথ দেখানো হয়েছে। সবার নিচেরটি জুন ২১ এর, আর সবার উপরেরটি ডিসেম্বর ২১ এর। আর এই পর্যবেক্ষণটি রটারডাম নামক স্থান থেকে গৃহীত। খেয়াল করুন:

- জুনের ২১ তারিখ সেখানে ভোর ৪টায় সূর্য উত্তর থেকে ৫০ ডিগ্রী কোণ করে, অর্থাৎ ঠিক পূর্ব থেকে উত্তরে ৪০ ডিগ্রী কোণ থেকে উদিত হয়েছে।
- ডিসেম্বরের ২১ তারিখ সেখানে সূর্য উদিত হয়েছে সকাল সোয়া ৮টায়। এবার সূর্য উদিত হয়েছে ঠিক পূর্ব থেকে দক্ষিণে ৪০ ডিগ্রী কোণ করে।
- অর্থাৎ ৬ মাসে সূর্যের উদয়স্থল বা উদয়াচলের পার্থক্য হচ্ছে ৮০ ডিগ্রী।
- একইভাবে অস্তাচলের ক্ষেত্রে জুন ২১ ও ডিসেম্বরের ২১ এ ৮০ ডিগ্রী পার্থক্য আছে।



এটাই কুরআনে উল্লিখিত দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের ব্যাখ্যা। উদয়াচল ও অস্তাচল প্রতিদিনই ভিন্ন হয়। কিন্তু গ্রীষ্ম ও শীতে এর পরিবর্তন ভাল করে বোঝা যায়। তাই দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহজে উপলব্ধির জন্য আয়াতে এই দুই ঋতুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

উপসংহার: আশা করি সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কিভাবে ঋতু বৈচিত্র হয় তা বুঝতে পেরেছেন, ইনশাআল্লাহ। । সব আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছায় সূর্যের গতিপথের পরিবর্তনের কারণে এবং আবারো আল্লাহর ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে।

### ইসলামের দৃষ্টিতে আগ্নেয়গিরি (এক টুকরো জাহান্নাম)

মহান আল্লাহর অনন্য নৈপুণ্য ও রহস্যময় সৃষ্টির নিদর্শন হলো বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা আগ্নেয়গিরিসমূহ। ল্যাটিন **Vul canus** অর্থ জ্বলন্ত পর্বত। শব্দটির ইতালিয়ান রূপ **Vul cano** এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ **Vol cano** এর বাংলা অর্থ হলো আগ্নেয়গিরি। তবে অনেকের মতে ইংরেজি **Vol cano** শব্দটি রোমানদের অগ্নিদেবতা **Vul can** থেকে নেওয়া হয়েছে।



গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন, ভূপৃষ্ঠের ৮০ শতাংশ সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত থেকে। পৃথিবীর ১৫ শতাধিক সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মধ্যে বেশির ভাগের অবস্থান সাগরতলো কার্যকারিতার বিবেচনায় সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় ও ঘুমন্ত তিন প্রকার আগ্নেয়গিরির ধারণা পাওয়া যায়। আবার উদিগরণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আগ্নেয়গিরি যৌগিক, ঢালবিশিষ্ট, মোচা আকৃতির ও গম্বুজ আকৃতির হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে আগ্নেয়গিরির লাভা নির্গমন হতে শুরু করলে তাপমাত্রা থাকে ৫০০ ডিগ্রির চেয়েও বেশি। তাইতো আগ্নেয়গিরি আমাদের অন্তরে জাহান্নামের ভয় জাগিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আগ্নেয়গিরি আসলে এক বিশেষ প্রকৃতির পাহাড়, যা সক্রিয় হয়ে উঠলে বের হয় উত্তপ্ত শিলা, ছাই ও গলিত লাভার স্রোত এবং তা ভূপৃষ্ঠের শীতল পরিবেশে দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে জমাট, কঠিন রূপ লাভ করে। হাওয়াইতে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরির নাম ‘মাউনা কিয়া’। সমুদ্র তলদেশ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩৩ হাজার ৫০০ ফুট, অর্থাৎ এভারেস্টের চেয়েও বেশি।

আগ্নেয়গিরির ভয়াবহতা জাহান্নামের আতঙ্ক ও নিত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে দুনিয়ার তাপমাত্রা তো শুধু জাহান্নামের উত্তাপের ৭১

ভাগের এক ভাগ মাত্র। অন্যদিকে মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতি যখন ইবাদতবিমুখ হয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয় তখন তার পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত ও পতিত করে। তাইতো আগ্নেয়গিরির মতোই পাপীদের জন্য জাহান্নাম সুপ্ত-গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই জাহান্নাম গোপন ফাঁদ। সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল।’ (সূরা নাবা, আয়াত : ২১, ২২)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘তোমরা জাহান্নামকে ভয় করো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।’ (আলে ইমরান, আয়াত : ১৩১)

আগ্নেয়গিরির মতোই জাহান্নামের স্তর রয়েছে। পাপীদের পাপের তারতম্য অনুযায়ী জাহান্নামের স্তর ঠিক করে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেকে যে যা করে সে অনুযায়ী তার স্থান নির্ধারিত রয়েছে।’ (সূরা আনআম, আয়াত : ১৩২)

আগ্নেয়গিরির মতোই জাহান্নামের গঠন আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হবে। আগ্নেয়গিরির একেকটি জ্বালামুখ যেন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত জাহান্নামের দরজাগুলোরই নমুনা মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : ‘অবশ্যই জাহান্নাম তাদের (পাপীদের) সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান। তাতে রয়েছে সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য আছে আলাদা আলাদা শ্রেণি।’ (সূরা হিজর, আয়াত : ৪৩-৪৪)

পাহাড়চাপা ভয়াল অগ্নিকুণ্ডের নাম আগ্নেয়গিরি। সাধারণভাবে শান্ত-সুপ্ত আগ্নেয়গিরি দেখাও মানুষের কাছে শখের বিষয় বা পর্যটন ভাবনার অংশ।

কিন্তু যখন আগ্নেয়গিরি জ্বলে ওঠে, উদিগরণ ও লাভাস্রোত বের হয় তখন বোঝা যায় কত শক্তি ও ভয়াবহ ক্ষতির ক্ষমতা ওই পাহাড়ের আড়ালে থাকা আগুনের, যাতে থাকে তাপ ও যন্ত্রণা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে তারাই হতভাগা। তারা পরিবেষ্টিত হবে অवरুদ্ধ অগ্নিতে’ (সুরা বালাদ, আয়াত : ১৯-২০)

মানবিক সম্পর্কে স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ হয়ে ওঠে অন্ধ এবং চায় ছলে-বলে, কলে-কৌশলে অন্যের ওপর আধিপত্য করতে। কেননা প্রাচুর্যের মোহ মানুষের সহজাত এবং পাপ ও পতনের এ পথেই মানুষ জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘পরিতাপ প্রত্যেক পশ্চাতে নিন্দুকের জন্য, যে সম্পদ জমা করে, গণনা করে এবং ধারণা করে এটাই তাকে অমর করবে। কখনোই নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হতামায়। তুমি কি জানো হতামা কী? এটা তো আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড (হতাশন)। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই তা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে’ (সুরা হুমাজাহ, আয়াত : ০১-০৯)

আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি ও ক্ষমতার মধ্যেও আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর শাহি দরবারে মুনাজাত—হে আল্লাহ! আমাদের জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

**ইসলামের দৃষ্টিতে জোয়ার ভাটা:**

কুরআনে জোয়ার-ভাটার কথা উল্লেখ নেই- এমনটা নয়, বরং বলা ভালো সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে, এ বিষয়ে কুরআনের দাবী হল-"এ গ্রন্থে কোনও কিছুই বর্ণনা বাদ দেওয়া হয় নি"(6:38, 12: 111, 22:70)।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي  
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।।

সূরা আন'য়াম ৬:৩৮ ]

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ  
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।। সূরা ইউসুফ ১২:১১১ ]

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।। সূরা হাজ্জ্ব ২২:৭০ ]

তবে কুরআনের আশ্চর্য মুজেজা হচ্ছে: ছোট এই আসমানী কিতাবটিতে সমস্ত কিছুই সরাসরি বা ইঙ্গিতে দেয়া আছে। এতে সব কিছু সরাসরি হয়ত পাবেন না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে পেতে পারেন। আর জোয়ার-ভাটার ব্যাপারটিও এ রকম।

**আল্লাহ তায়ালা বলেন:**

আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি। [ [সূরা হিজর ১৫:২১](#) ]

-----

গায়েবের জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যা কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'লার। এটি আপনি কোনোভাবেই পরিপূর্ণরূপে জানতে পারবেন না। গায়েবের কিছু বিষয়ে শরীয়তে সামান্য বর্ণনা থাকতে পারে কিন্তু সেসবকে সেভাবেই রেখে দেয়া উত্তম। নিজের বুঝে বুঝতে যাওয়া একদমই অনুচিত। কেননা ঐযে, ঐসব বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান কেবল আল্লাহর। উপরন্তু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'লা তার সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বিষয় গোপন রাখতে পছন্দ করেন বিধায় আপনি চাইলেই সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না। এই অসম্ভব বিষয়টাই শয়তানের দেখানো বিকৃত সৃষ্টিতে সম্ভব হয়েছে ; বিজ্ঞান তো কেবল মোড়ক মাত্র যেন সকলের কাছে ব্যাপারগুলো গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

বিজ্ঞানের বলা সৃষ্টিতে আপনি প্রায় সব কিছুরই ব্যাখ্যা পাবেন - হোক না ভুলে ভরা মিথ্যায় ভরপুর! কিন্তু ইসলামে এসব ছলচাতুরীর কোনো জায়গা নেই, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানতে দেয়া হয়নি সেসব বিষয়ে কি উত্তর দিব আপনাকে? বিজ্ঞানের ন্যায় নিজের বানানো সুত্রকে প্রকৃতির নিয়ম বলে চালান দিয়ে মান বসিয়ে বলব "ব্যস, প্রমাণিত?" মুখতা নয়, আমরা আল্লাহর নারাজির ভয় করি বিধায় সেসব বিষয়ে আমরা চুপ থাকি এবং **according to Quran**, "শুনলাম ও মেনে নিলাম" রূপে বিনা বাক্যে বিশ্বাস করি এবং এটাই মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানপুজারীরা সবকিছুর ব্যাখ্যা খুজে অথচ বুঝে না যে ইসলাম সবকিছুর ব্যাখ্যা দিয়ে ঈমান আনাতে সেটা ঈমান-ই হতো না। জোয়ার ভাটার ব্যাপারটাও তেমন। এটার ইসলামী কোনো ব্যাখ্যা নেই।

সারকথাঃ আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে নাক গলানো মূর্খের কাজ, সেসব গায়েবের বিষয়ে চুপ থাকা শুধু শ্রেয়-ই নয়, বাঞ্ছনীয়।

-----

তবুও আমরা এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত একত্র করেছি, যাতে জোয়ার ভাটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

**আল্লাহ তায়ালা বলেন:**

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ  
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই। [ [সূরা হিজর ১৫:২২](#) ]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মতো, অতপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করে থাকি। অতপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।’ (সূরা মুমিনুন : আয়াত ১৮-১৯)

### পিপাসা নিবারণে...

আল্লাহ মানুষের পিপাসা নিবারণের জন্য সুস্বাদু পানির ব্যবস্থা করেছেন। যা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন? না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?’ (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৬৮-৭০)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ



তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিষিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় (নিয়োজিত করেছেন) (১৪:৩২)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুত্তাকী মুমিনরা ঠিকই বুঝে ফেলেছেন যে, জোয়ার ভাটা কিভাবে হয়। আর যারা এখনো বুঝতে পারেননি তাদের জন্যে নিচে আরো দুটি দলিল দেয়া হলো। এই দুটি আয়াতে একদম সরাসরি বলা হয়েছে। একবারে না বুঝলে, বার বার পড়ুন। বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি (জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম) (২৩:১৮)

আল্লাহ বলেনঃ

نَمْعٍ بِمَاءٍ يَأْتِيكُمْ فَمَنْ غَوْرًا مَّاؤُكُمْ أَصْبَحَ إِنْ أَرَأَيْتُمْ قُلْ

বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা? (৬৭:৩০)

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম বৃষ্টি পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির ভান্ডারকে আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরতের দ্বারা বাড়িয়ে ও কমিয়ে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি করেন

তাফসীরে মারেফুল কোরআনে এই স্রোতধারা বলতে সাগর ও নদীর স্রোতকে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন জায়গার বরফ গলে নদীর পানির স্তর বেড়ে যাওয়ার কথাও আছে

### ছায়াপথ ও রংধনু:

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস বলেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুয়াবিয়া (রা) এর নিকট পত্র লিখেন এবং এ সময় তিনি বলেন যে, যদি মুসলমানদের নিকট নবুওতের শিক্ষার কিছুটাও অবশিষ্ট থাকে তবে অবশ্যই তারা আমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিবো ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পত্রে তিনি মুয়াবিয়া (রা) কে ছায়াপথ, রংধনু এবং ঐ ভূখণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যাতে স্বল্প সময় ব্যতীত কখনও সূর্যের আলো পৌঁছেনি। ইবনে আব্বাস বলেন, পত্র ও দূত এসে পৌঁছলে মুয়াবিয়া বললেন, এ তো এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবো বলে এ যাবৎ কখনো আমি কল্পনাও করিনি। কে পারবেন এর জবাব দিতে? বলা হলো, ইবনে আব্বাস (রা) পারবেন। ফলে মুয়াবিয়া (রা) হিরাক্লিয়াসের পত্রটি গুটিয়ে ইবনে আব্বাসের নিকট পাঠিয়ে দেন। জবাবে ইবনে আব্বাস লিখেন: রংধনু হলো পৃথিবী বাসীর প্রতি নূহ (এ) এর পর নিমজ্জন থেকে নিরাপত্তা। ছায়াপথ হলো আকাশের সেই দরজা, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হবে আর সে যে ভূখণ্ডে দিনের কিছু সময় ব্যতীত কখনও সূর্য পৌঁছেনি, তাহলো সাগরের সেই অংশ যা দুভাগ করে

বনিইস্রাঈলদেরকে পার করানো হয়েছিল।

ইবনে আব্বাস পর্যন্ত এই হাদীসের সনদটি সহীহ।

নবীজি (স) স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রা) এর জন্য তাফসীরের জ্ঞানার্জনের জন্য দোয়া করেছিলেন। তাই তাঁর থেকে আমরা আজ রংধনু ও ছায়াপথের উৎস সম্পর্কে জানলাম।

তথ্যসূত্রঃ হাফিজ ইবনে কাছীর প্রণীত আল-বিদায়া ওয়ান -নিহায়া কিতাব প্রথম খন্ড

### **সমতলে বিছানো পৃথিবীতে এস্টরয়েড (গ্রহাণু বা উল্কা):**

গ্রহাণু বলতে আমরা যা বুঝি তা ভুল। গ্রহাণু হচ্ছে তারকা / তারা। যেগুলোকে আমরা আকাশে সবসময়ই দেখি। জিনেরা যখন ফেরেস্তাদের কোনো কথা চুরি করে শুনার জন্য আকাশে গিয়ে আড়ি পাতে তখন এই তারা গুলোকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো জিনদেরকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা হয়। এগুলোর নাম অপবিজ্ঞানীরা দিয়েছে এস্টরয়েড বা উল্কা। আঞ্চলিক বাসায় আমরা বলি তারা খসে পড়া। আমি নিজে বহুবার এরকম দেখেছি। গ্রহাণুর আক্রমণ যখন বেড়ে যাবে (যেমনটা শুনা যাচ্ছে, অমুক দিন বা তমুক দিন একটা গ্রহাণু পৃথিবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে) তখন বুঝতে হবে জিনেরা আকাশে তথ্য চুরি করার জন্য বেশি বেশি যাতায়াত করছে। সম্ভবত ইমাম মাহদীর আগমনের খবর নেয়ার জন্য জিনেরা বার বার আকাশে যাচ্ছে। এসব গ্রহাণু বা তারকা খন্ড গুলো হচ্ছে বিশাল বিশাল পাথর। এগুলোর একেকটার একেক রকম আকৃতি রয়েছে। ৩০০ - ৪০০ মাইল চওড়া বা এর চেয়েও বিশাল আকৃতির আছে। আল্লাহ্ আলম। পৃথিবীতে যেগুলো আঘাত হানে সেগুলো আধা / এক মাইল চওড়া হয়। এসব পাথরের আঘাতে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় গর্ত সৃষ্টি

হয়েছে। যা পরবর্তীতে হ্রদ বা লেকে পরিণত হয়েছে। এগুলো যে শুধু আকাশে যাওয়া জিনদেরকেই মারা হয় তা নয়। পৃথিবীতে থাকা জীন ও কালো জাদুকরদেরকেও মারা হয়। আবার অশ্লীলতা ও পাপাচার যেখানে বেড়ে যায়, সেখানেও নিক্ষেপ করা হয়।



প্রচলিত অপবৈজ্ঞানিক (হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজি / গ্লোব আর্থ) থিওরি অনুযায়ী এধরণের বিশাল গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাকাশে হারিয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবী বলের মতো ছোট্ট কোনো খেলনা নয়। বরং পৃথিবী আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক অনেক বড়, প্রসস্থ ও সমতলে বিছানো, স্থির, এবং পাহাড় দিয়ে পেরেকের মতো আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যেন এধরণের গ্রহাণুর আঘাতে নড়ে না যায়।



এছাড়াও আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন: জিব্রাইল (আ:) কে আল্লাহর রাসূল যখন নিজের আকৃতিতে দেখেছিলেন, তখন দেখা গেছে তার(জিব্রাইল আ:) পা জমিনে এবং মাথা আকাশে। এখান থেকেও আমরা একটা তথ্য নিতে পারি।



এরকম একজন ফেরেস্টাকে ধারণ করার মতো জায়গা পৃথিবীতে আছে। নাসা আমাদের কে বুঝায় পৃথিবী অনেক ছোট। কিন্তু না। পৃথিবী অনেক অনেক অনেক বড়। এখানেই হাশর কায়েম হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমাদের এই পৃথিবী কতটা বড়। অপারেশন হাই জাম্প সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।



((আমাদের চেনা ম্যাপের বাহিরে অন্য এক  
পৃথিবী)): (([HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/.../PERMALINK/500338324234469/](https://www.facebook.com/.../PERMALINK/500338324234469/)))



ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, টর্নেডো, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ইত্যাদি)

দুটো আর্টিকেল দেয়া হলো :

আর্টিকেল-১

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির নিজস্ব কোনো সৃষ্টি নয়। বরং জল-স্থল, চন্দ্র-সূর্য, আলো-বাতাস তথা প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানে যা কিছু ঘটে সেগুলো মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনাও তারই ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মানুষের কৃতকর্ম। সমাজে অন্যায়-অনাচার বেড়ে গেলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে বেশি। রাসুল [সা.] হাদিসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও উম্মতের ওপর দুর্যোগের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন। তিনি দোয়া করেছেন যেন তার উম্মতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে এক সঙ্গে ধ্বংস না করা হয়। কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে রাসুল [সা.]

বিচলিত হয়ে পড়তেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন। বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফার করতেন এবং অন্যদেরও তা করার নির্দেশ দিতেন। ঝড়-তুফান শুরু হলে তিনি মসজিদে চলে যেতেন। নফল নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাতেন। রাসূল [সা.]—এর এই আমল দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী তা জানতে পারি। আমাদের উচিত নিজেদের আমল-আখলাক বিশুদ্ধ করে খাঁটি মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

## আর্টিকেল-২

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণত আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য সতর্কতামূলক বার্তা। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো তাঁর বিধানের সীমা লঙ্ঘনের কারণে মানুষের প্রতি দুর্যোগ চাপিয়ে দেন। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়ভীতির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের ঈমানের পরীক্ষা নেন। এ ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, ‘আমি তোমাদের ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, সম্পদ, প্রাণ ও ফসলের হানি করে পরীক্ষা করব। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যাদের ওপর বিপদ আসলে তারা বলে, আমরা আল্লাহর জন্যই, আমরা তার দিকেই ফিরে যাব। তাদের ওপর তাদের রবের ক্ষমা ও রহমত অবতীর্ণ হয়। আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।’ (সূরা বাক্বারা : আয়াত ১৫৫- ১৫৭)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুমিনের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে তাঁর সাহায্য কামনা করা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি তার ইবাদাত-বন্দেগি করে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করা।

হাদিসে এসেছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘মুমিনের বিষয়টি সত্যিই আশ্চর্যের! তার প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। যদি তারা (মুমিন বান্দা) সুখে থাকে তবে শুকরিয়া আদায় করে, যার ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর সে বিপদে পড়লে ধৈর্য ধরে, তাও তার জন্য মঙ্গলজনক হয়।’ (মুসলিম)

কুরআনে আরো এসেছে, ‘গুরু শক্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শক্তি আশ্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে’ (সূরা সাজদা : ২১) এ আয়াতের তাফসিরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ছোট শক্তি হলো দুনিয়ার বিপদাপদ, রোগব্যাদি, মৃত্যু এবং তাদের ওপর নেমে আসা অন্যান্য মুসিবত, যা দিয়ে আল্লাহ তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন, যাতে বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।’

**মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রসঙ্গে:**



সাধারণত মনে করা হয়, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এসবই হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খেয়ালী প্রাকৃতিক কারণে সময় সময় এসব হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন জাগে, এ বিপর্যয় কেন হলো? এমন ভয়াবহ বিপদের কারণ কি? তথাকথিত প্রকৃতিই কি এর জন্য দায়ি? এতে মানুষের অন্যায়- অনাচারের কোনো প্রতিক্রিয়া কি নেই?

বিজ্ঞান এ প্রশ্নের জবাবে নীরব। জ্ঞান অর্জনের আর সকল সূত্রই এ পর্যায়ে অকেজো। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল- কুরআন এ সম্পর্কে নীরব নয়। যেহেতু কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব, যেহেতু এ মহান গ্রন্থ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যেহেতু পবিত্র কুরআনই সর্বকালীন মানুষের মুক্তির চিরস্থায়ী মহাসনদ, তাই পবিত্র কুরআনেই রয়েছে এ প্রশ্নের জবাব।

পবিত্র কুরআন আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় কেন আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়াবহ বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি। কেন বারবার নেমে আসে ধ্বংস মানুষের জীবনো এ পর্যায়ে আল- কুরআনে সর্বপ্রথম যে নীতি নির্ধারণীর কথা বলেছে তা এই, “এবং (হে রাসূলা) আপনার প্রতিপালক সে পর্যন্ত কোনো লোকালয় ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত না তার সদর স্থানে কোনো রাসূল প্রেরণ করেন। যে সেই জনপদবাসীর নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, আর যেসব জনপদের অধিবাসীরা অত্যাচারী, আমি শুধু তাদেরই ধ্বংস করি।” এতে এ কথাই প্রমাণিত

হচ্ছে যে, যদি কোনো স্থানের মানুষ জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হয়, তাদের প্রতিই আপতিত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি ধ্বংস নেমে আসে। আল-কুরআনে এসব বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে কিন্তু কুরআন খুলে দেখার লোক নেই, সতর্ক হতেও কেউ রাজি নেই।

মূলত পৃথিবীর ইতিহাসে রয়েছে এর বহু প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালার নাফরমান জাতিগুলোকে তিনি জগতের বুকে অশান্তি সৃষ্টি করার শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস করে দিয়েছেন চিরতরো পবিত্র কুরআনে পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এ ঘটনাবলীর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। যারা তাদের অন্যায় আচরণের দরুন আল্লাহ কোপগ্রস্ত হয়েছে আগামী দিনের মানুষ যেন তাদের অনুসরণ করে এমনিভাবে বিপদগ্রস্ত না হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : “তারা কি দেখে না যে তারা প্রতিবছর একবার অথবা দু'বার বিপদগ্রস্ত হয়, অতঃপর তারা তওবা করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না” [তওবা ৯: ১২৬]

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক বছর দেশে যে বন্যা, মহামারি, ঝড়, তুফান, টর্নেডো এবং এমনি আরো বিপদাপদ আসে এ সমস্ত বিপদ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে পবিত্র করে তোলা।

আমাদেরকে তওবা করার সুযোগ দেয়া। মোট কথা, এর পশ্চাতেও রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য, তা হলো, আমাদের সংশোধন। এতে রয়েছে আমাদের জন্য সতর্ক সংকেত আর এ দুর্যোগ প্রকৃতির খেয়াল-

খুশিমতো নয়, বরং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী আসে। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালার ইরশাদ করেছেন : “আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যতীত কোনো বিপদই আসে না। ( অর্থাৎ সকল বালা- মুসিবত বিপদাপদ একমাত্র সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার আদেশানুযায়ী এসে থাকে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে তার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করে, আর আল্লাহ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। [ তাগাবুন ৩ঃ ১১]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করেন ৩ঃ “মানুষের কর্মের পরিণতিস্বরূপ স্থলে ও সমুদ্রে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, যাতে করে মানুষ ফিরে আসে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা স্বাদ ভোগ করাতে চান।” [ রুম ৩ঃ ৪১] অর্থাৎ মানুষের অন্যায় আচরণের কারণে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং নাফরমানির দরুনই আজ পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে এবং চতুর্দিকে বিপদের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। বস্তুত আমাদের জন্য এ বিপদও কল্যাণকর হতে পারে যদি আমরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করি এবং আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করি। শুধু এভাবেই আমরা পরকালের আজাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। আর আল্লাহও চান যেন আমরা ইহকাল ও পরকালের আজাব থেকে মুক্তি লাভ করি।

আল্লাহ ইরশাদ করেন : “যদি তোমরা সৎ কাজ কর তবে তা তোমাদেরই উপকারার্থে, এর ফল তোমরাই ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা অন্যায় কার্যে লিপ্ত হও তবে তার শাস্তিও তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।” [ বনি ইসরাইল ৩ঃ ৭]

অতএব যখনই পৃথিবীতে ঝড়- তুফান, ঘূর্ণিবর্তা, বন্যা এবং এ ধরনের বিপদ আসে, তখনই পরকালের মুক্তিকামী মানুষ সাবধান হয়, অন্যায় পথ পরিত্যাগ করে ন্যায়পথের অনুগামী হয়। অন্যায়- অনাচার, জুলুম- অত্যাচার, পাপ- পংকিলতায় পূর্ণ জীবন, আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা এবং নির্লজ্জতা, অশ্লীলতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নেমে আসে আসমানী- যমিনী বালা- মুসিবত, ভয়াবহ ঝড়- তুফান, টর্নেডো এবং বন্যা দেখা দেয় দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া অগ্নিকান্ড মহামারি, ভূমিকম্প আর ধ্বংসা তখন সর্বাত্মে আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, তওবা এস্তেগফারের পথ অন্বেষণ করা, কৃত অন্যায়ের জন্য আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে অন্যায়- অনাচারে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার করা, আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপাত আমাদের পাপ মোচনের জন্য সহায়ক হতে পারে।

### **অ্যান্টার্কটিকার সবুজ বরফ এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তের আলোচনা:**

প্রথমে উইকিপিডিয়ার তথ্য গুলো পড়ুন।

**অ্যান্টার্কটিকা** হল পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মহাদেশ। ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু এই মহাদেশের অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধের অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে প্রায় সামগ্রিকভাবেই কুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত এই মহাদেশটি দক্ষিণ

মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১,৪২,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার (৫৫,০০,০০০ বর্গমাইল) আয়তন-বিশিষ্ট অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশ এবং আয়তনে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সর্বনিম্ন জনবসতিপূর্ণ মহাদেশ। এই মহাদেশের জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.০০০০৮ জন। অ্যান্টার্কটিকার ৯৮% অঞ্চল গড়ে ১.৯ কিমি (১.২ মা; ৬,২০০ ফু) পুরু বরফে আবৃত।<sup>[৫]</sup> অ্যান্টার্কটিক উপদ্বীপের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত অংশগুলি বাদ দিয়ে সর্বত্রই এই বরফের আস্তরণ প্রসারিত।

**অ্যান্টার্কটিকা** মহাদেশে মূলত দু'টি ঋতু; শীত ও গ্রীষ্মকাল। এ দুই ঋতুতে অ্যান্টার্কটিকায় সত্যিকার অর্থেই একেবারে রাত আর দিন পার্থক্য। অ্যান্টার্কটিকায় গ্রীষ্মকালে সূর্য কখনোই পুরোপুরি অস্ত যায় না। এ সময় দিগন্ত রেখা বরাবর সূর্য চারদিকে ঘুরতে থাকে আর শীতকালে সেখানে টানা চার মাস সূর্যই ওঠে না। অ্যান্টার্কটিকার এই দীর্ঘ রাতের আকাশে চাঁদ উঠলে তা টানা এক সপ্তাহ পর্যন্ত দেখা যায়। সাধারণত শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা থাকে -৮০ থেকে -৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে এর তাপমাত্রা থাকে ৫ থেকে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এবার অন্যান্য ব্লগের আটিকেল পড়ুন।

## Article-1

রহস্যে ঘেরা এন্টার্কটিকা, বরফের নিচে পর্বতশ্রেণীর সন্ধান

পশ্চিম এন্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ বরফস্তরের নিচে রয়েছে আস্ত একটা পর্বতশ্রেণী। তাদের মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কয়েকশ'মাইল ছড়ানো তিনটি উপত্যকাও। এই অনুসন্ধান নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স' পত্রিকায়।

জানা গেছে, বেশ কয়েকটি কৃত্রিম (drone / balloon) উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের ছবি তুলে চলেছে। মাটির গভীরে কোথায় কী রয়েছে, তার ছবিও ধরা পড়ে তাতে। কিন্তু সেগুলোর প্রায় সবই এমন ভাবে পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে যে, দক্ষিণ মেরুর ওই অংশ এত দিন ধরা পড়েনি সেগুলোর ক্যামেরা বা রাডারে। তাই বরফ ভেদ করে দেখতে পায় এমন বিশেষ রাডারের সাহায্যে এই মহাদেশের মানচিত্র নতুন ভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। আর তাতেই উঠল পর্দা।

'পোলার গ্যাপ' নামে গবেষকদের বিশেষ এই অনুসন্धानে ধরা পড়েছে, পশ্চিম এবং পূর্ব এন্টার্কটিকার বরফের আন্তরগকে জুড়ে রেখেছে ওই তিন উপত্যকা।

## Article-2

সবুজ পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় অঞ্চল শুভ্র অ্যান্টার্কটিকা ।

পৃথিবীর শুষ্কতম ও শীতলতম মহাদেশ। দক্ষিণ মহাসাগর দিয়ে ঘেরা এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম এই মহাদেশের লুকিয়ে আছে কত অজানা রহস্য। যার অনুসন্ধানে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দেশের শতশত বিজ্ঞানী, অভিযাত্রী ছুটে গেছেন এই মহাদেশ।

বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সূর্যমামার দেখা পাওয়া যায় না এখানো। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানকার তাপমাত্রা অনেক কম থাকে -  $১০^{\circ}$  সেলসিয়াস

থেকে  $-63^{\circ}$  সেলসিয়াসের মধ্যে দিনের তাপমাত্রা উঠানামা করে। মে থেকে জুলাই মাসের ভেতরে সূর্যমামার সামান্য আলো এখানে পাওয়া যায়।

### এই অ্যান্টার্কটিকার অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে এর সবুজ বরফ।

সূর্য রশ্মি নীল রঙের প্রতিফলন ঘটায় বলে বরফের রং হয় হালকা নীলা। এ কারণেই সমুদ্রে ভাসতে থাকা বেশিরভাগ হিমশৈলের রং নীল অথবা সাদা। কিন্তু অ্যান্টার্কটিকার পূর্বদিকের সমুদ্রে অত্যন্ত দুর্লভ সবুজ হিমশৈল ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। গত প্রায় ১০০ বছর ধরে এ অঞ্চল নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী, অভিযাত্রী, নাবিকরা মহাসাগরে ভাসতে থাকা এই সবুজ অদ্ভুতদর্শন হিমশৈলের কথা বলেছেন।



তারা বিভিন্ন সময় তাদের গবেষণার জন্য বা অভিযাত্রীরা, নাবিকরা যখন এসব অঞ্চলে অবস্থান করতেন বা অঞ্চলের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তারা এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পান। এবং পরে এ খবরটি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

লরা হেরেইজ, যিনি অস্ট্রেলিয়ান তাসমানিয়া ইউনিভার্সিটির একজন সমুদ্র বিজ্ঞানী

। তিনি ১৯৮০ সালে অ্যান্টার্কটিকায় অভিযানে যান। সেখানে তিনি **Amery Ice Shelf** এর বরফে থাকা লোহার পরিমাণ পরীক্ষা করেন। এই বরফের মধ্যে হিমবাহের বরফের তুলনায় ৫০০ গুণ বেশি লোহা ছিল।

এরপর ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির হিমবাহবিদ, স্টিফেন ওয়ারেন তার দলবল নিয়ে অ্যান্টার্কটিকায় পৌঁছান সবুজ হিমশৈলর রহস্য সন্ধানের জন্য। সেখানে পৌঁছে তিনি পেয়ে যান একটি প্রকাণ্ড হিমশৈল। এবং সরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়েন এর উপর।

তিনি রীতিমত বিস্মিত হয়ে যান হিমবাহটির স্বচ্ছতা দেখে। এটি ছিল কাঁচের মত স্বচ্ছ। এর ভেতরে ছিল না কোন বাতাসের বুদবুদ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটি কোন সাধারণ হিমশৈল নয়।

**Mysterious green icebergs from Antarctica might be fertilizing the southern ocean**

<https://www.cbc.ca/radio/quirks/july-27-2019-shopping-for-souvenirs-on-an-asteroid-new-cambrian-explosion-fossils-and-more-1.5065927/mysterious-green-icebergs-from-antarctica-might-be-fertilizing-the-southern-ocean-1.5065946>



## Article-3

পৃথিবীর শেষস্থান বা শেষ প্রান্ত নামে খ্যাত কিছু জায়গার নাম তুলে ধরা হলঃ

- পৃথিবীর ম্যাপের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে **চেপটা**  
**টরোলটুংগা(নরওয়ে)** নামক একটি জায়গা আছে যাকে **পৃথিবীর শেষ প্রান্ত** বলা হয়। এই স্থানটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উপরে নরওয়ের এই স্থানটির পরে আর কিছু পাওয়া যায়না শুধু বরফ আর বরফ।
- আবার অনেকের নিকট পৃথিবীর শেষ প্রান্ত নামে পরিচিত  
**রাশিয়ার ইয়ামাল পেনিনসুলা এলাকা।** এইস্থানে মহাকাশ থেকে কোন ভারী উল্কার আঘাতে তৈরি হয়েছে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এটা নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই।
- অনেকে নরওয়ের **রোগাল্যান্ডের** একটি পাহাড়ি পর্যটন এলাকাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলে থাকে।
- আর্জেন্টিনার নিকটবর্তী সমুদ্র অঞ্চলে **টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো** দ্বীপপুঞ্জকে পৃথিবীর শেষ সীমা হিসেবে কল্পনা করা হয়। উল্লেখ্য **টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো** নামের অর্থই হলো পৃথিবীর শেষ সীমা।
- **কেপহর্ন (Capehorn)** - চিলির কেপহর্ন ড্রাক প্যাসেজের উত্তর সীমানায় অবস্থিত এবং এই সেই জায়গা যেখানে অ্যান্টার্কটিক এবং প্রশান্ত মহাসাগর মিলিত হয়েছে। এটি পর্যটকদের কাছে একটি প্রধান আকর্ষণের জায়গা। চবে নৌ চলাচলের জন্য এই জায়গা খুবই দুর্গম বলে মনে করা

হয়। বেশ কিছু তদন্তকারী এই জায়গাটিকে পৃথিবীর শেষ হিসাবে বিবেচনা করে।

- **ওয়েস্ট সাসেক্স (West Sussex)-** ইংল্যান্ডে অবস্থিত একটি দেশ হল ওয়েস্ট সাসেক্স। সাসেক্সে পর্যটকদের ভীড় লেগেই থাকে। তবে এই জায়গাটি খুব একটা উন্নত না হলেও এর প্রাকৃতিক শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পশ্চিম সাসেক্স-এর নীচে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে অনেকগুলি দেখার মতো জায়গা রয়েছে। এই দেশে প্রায় ২,২০০০ বাড়ি রয়েছে বলে জানা যায়।

বলাবাহুল্য, এই প্রত্যেকটি জায়গাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের ওপর ভর করেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কোনও সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে পর্যটকদের জন্য এই জায়গাগুলি রোমাঞ্চে ভরা।



RM: ২ নং আটিকেল অনুযায়ী আমরা কাঁচের মত স্বচ্ছ সবুজ হিমশৈলির কথা জানতে পারলাম। কথিত বিজ্ঞানীরা তাদের মতো করে দুনিয়াবী ব্যাখ্যা দিবে এটাই স্বাভাবিক। তারা বলছে এটা শ্যাওলা বা কোনো জীবাশ্মের কারণে হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু কোরআন ও হাদিস রয়েছে, আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখবো। আমাদের মতে এটা কাফ পর্বতমালার কোনো অংশ হবো। যার পরে মানুষের আর সামনে এগোনোর সুযোগ নেই। অর্থাৎ এটাই জমিনের প্রান্ত সীমা। আল্লাহ্ আলম। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানুন নিচের এই ব্লগ থেকে।

[https://aadiaat.blogspot.com/2018/11/blog-post\\_26.html](https://aadiaat.blogspot.com/2018/11/blog-post_26.html)

আর ৩ নং আটিকেল থেকে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য শেষ প্রান্ত সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পেলাম। এই ধারণাগুলোকে একেবারে ফেলে দেয়া যায়না। আমাদের কাছ থেকে তো অনেক সত্যকেই গোপন করা হয়। আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়যে, আমরা ওখানে গিয়ে সত্যতা যাচাই করবো। তবে যেহেতু আমাদের কাছে এলমে লাদুনী আছে, আমরা তা দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে ও বের করে আনতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আর হজরত যুলকারনাইনের ভ্রমণ থেকে আমরা পূর্ব ও পশ্চিমের শেষ প্রান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা নিতে পারি। এ ব্যাপারে পড়ুন।

হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সম্ভাব্য উদয় ও অস্তাচল:

[https://toorpaahaar.blogspot.com/2020/11/blog-post\\_15.html](https://toorpaahaar.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html)

<https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2718712125120290>

## সমতলে বিছানো পৃথিবীতে নর্থ ও সাউথ পোল, স্টার ট্রেইলস, অরোরা লাইট

### & আলাঙ্কা:

গবেষকরা প্রকৃতির হাজারো রহস্য এখনো উন্মোচন করতে পারেনি। এতে নিশ্চই আপনি বলবেন না যে, যেহেতু এসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি, সুতরাং গবেষকদের কোনো অস্তিত্ব নেই। একই ভাবে সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কিছু ব্যাখ্যা না পাওয়াতে আপনি এই কুরআনিক সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। অর্থাৎ কোনো প্রাকৃতিক রহস্যের ব্যাখ্যা না পেলে, স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী নিশ্চই ঘূর্ণায়মান ও বলাকার হয়ে যাবে না।

টাইটেলে বর্ণিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা পাওয়া বা না পাওয়ার সাথে সমতলে বিছানো পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। সব ব্যাখ্যা পেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সমস্ত ব্যাখ্যা যদি আপনি বিজ্ঞানের আলোকে পেতে চান, তাহলে একসময় আপনার অন্তর বিজ্ঞানের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। ইসলামের প্রতি নয়। আপনার সাবকনশাস (নফস) মাইন্ড আপনাকে দিয়ে এটা করাবে। সুতরাং কিছু জিনিস সম্পূর্ণ আল্লাহর দিকে ছেড়ে দিয়ে অন্তরের গভীর থেকে সুবহানআল্লাহ বলতে হয়। কথিত বিজ্ঞানীদের অপব্যাখ্যা দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে হয়না।

এখন অনেকেই হয়তো বলবে: ব্যাখ্যা দিতে না পেরে এসব কথা। তাদের জন্য সাধ্যমত কিছু ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

### নর্থ ও সাউথ পোল:

২১ মার্চ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত দিন ও দক্ষিণ মেরুতে অবিরত রাত থাকে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ মার্চ ঘটে উল্টোটি মানে ৬ মাস একটানা দক্ষিণ মেরুতে দিন ও উত্তর মেরুতে রাত। তার মানে ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর হচ্ছে মেরুদ্বয়ে রাত দিন পাল্টানোর দুই প্রান্তিক তারিখ। এই দুই দিন উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে।

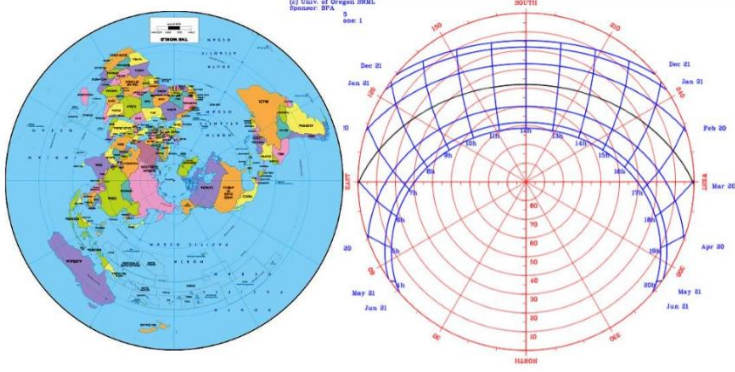
২১ মার্চের পর সূর্য উত্তর মেরুর দিকে ঝুঁকতে থাকে। ঝুঁকতে ঝুঁকতে ২১ জুন গিয়ে ঝোঁকার পরিমাণ হয় সর্বোচ্চ। ২১ জুনের পর সূর্য এবার উত্তর মেরু থেকে দূরে সরতে থাকে। সরতে সরতে ২৩ সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ মেরু থেকে সূর্য সমান দূরত্বে থাকে। এই ছয় মাস উত্তর মেরুতে (প্রকৃত অর্থে মেরুবৃত্তে) সূর্য দিগন্তের উপরে অবস্থান করে। তাই তখন এখানে দিন। অপর দিকে এই সময় দক্ষিণ মেরুবৃত্ত দিগন্তের নিচে অবস্থান করায় সেখানে রাত হয়।

সূর্য, উত্তর মেরু থেকে সরতে সরতে ২৩ সেপ্টেম্বরে এসে দক্ষিণ মেরুর সমান দূরত্বে পৌঁছেছিল। এবার সে আরো সরতে থাকে। এভাবে ২২ ডিসেম্বর সূর্য, উত্তর মেরুর সবচেয়ে দূরে ও দক্ষিণ মেরুর সবচেয়ে কাছে থাকে। এবার সূর্যের আবার সরার পালা। সূর্য সরতে থাকে আর উত্তর মেরুর দূরত্ব পুনরায় কমতে থাকে।

এভাবে ২১ মার্চ আবার সূর্য, দুই মেরু থেকে সমান দূরে থাকে। ফলে, এই ছয় মাস দক্ষিণ মেরুতে দিন আর উত্তর মেরুতে রাত হয়।

অর্থাৎ সূর্য আবার উত্তর মেরুর দিকে রওয়ানা দেয় এবং দক্ষিণ মেরু থেকে দূরে সরতে থাকে। এভাবেই ৬ মাস দিন রাত হয়। সহজ কথায়, সূর্য যখন উত্তর মেরুতে থাকে তখন ঐদিকে ৬ মাস দিন থাকে আর দক্ষিণ মেরুতে ৬ মাস রাত থাকে।

ঠিক একই ভাবে দক্ষিণ মেরুর ব্যাপারটাও তাই। প্রদত্ত ছবির দিকে ভালো করে খেয়াল করলে খুব সহজেই বুঝে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ।



### আলাস্কা:

এবছর (2020) আর সূর্যের (Sun) দেখা পাবেন না আলাস্কার (Alaska) এই শহরের বাসিন্দারা! উৎকিয়াংভিক নামের এই ছোট্ট শহর ২০২০ সালের শেষ সূর্যাস্ত দেখে ফেলেছে গত বুধবার। ওইদিন স্থানীয় সময় দেড়টা নাগাদ দিগন্তের নিচে চলে গিয়েছে সূর্য। আবার সে ফিরে আসবে ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারি! মাঝে ৬৫ দিন সূর্যের সাক্ষাৎ পাবেন না ব্যারো নামে পরিচিত এই শহরের অধিবাসীরা।

হ্যাঁ, এটি অবিশ্বাস্য তবে সত্য! আদতে পৃথিবীর একেবারে প্রান্তদেশে অবস্থানের কারণেই এমনটা ঘটে। এই সময়টাকে বলে ‘পোলার নাইট’ (Polar Night)। অর্থাৎ মেরু রাত্রি। আর্কটিক সার্কেলের উত্তরে অবস্থিত ছোট্ট শহরটি তার বার্ষিক অন্ধকার সময়ে প্রবেশ করেছে, যা পোলার নাইট হিসাবে পরিচিত।

তাহলে কি এই দু'মাসেরও বেশি সময় অন্ধকারে ডুবে থাকবে শহরটা? না, তেমনটা হবে না। এই সময়কালে রোজই ভোর হবে নিয়ম করে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে নয়, আলো থাকবে কয়েক ঘণ্টা। তারপর তা কমে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে। কিন্তু আলো থাকার সময়ও দিগন্তের উপরে মুখ তুলতে দেখা যাবে না সূর্যকে। সে থাকবে অদৃশ্যই।

উপরের নর্থ পোল ও সাউথ পোলের আলোচনা থেকে নিশ্চই বুঝে ফেলেছেন, এখানে কি হয়। আলাস্কা যেহেতু পৃথিবীর উত্তর দিকে, আর শীতকালে সূর্য দক্ষিণ মেরু বা গোলার্ধে চেপে যায়। সেহেতু ওখানে এমনটা হওয়া খুব স্বাভাবিক। শুধু আলাস্কাই নয়। ওখানের আশেপাশের আরো অনেক দেশেই এমন ঘটনা ঘটে। এমনকি রাতের বেলায়ও সূর্যকে (মিড্ নাইট সান) দেখা যায়।



এ ব্যপারে নিচের আটিকেল টি পড়তে পারেন।

পৃথিবীতে রয়েছে এমন কিছু স্থান যেখানে সূর্য কখনোই ডোবেনা! জেনে নিন  
এমনই কিছু স্থান সম্পর্কে।

## ১. নরওয়ে

শুনতে অবাক করা হলেও নরওয়ের উচ্চ অক্ষাংশের জন্যে এখানকার বেশিরভাগ  
স্থানে গরমের সময়টা, অর্থাৎ মে থেকে জুলাই অব্দি সূর্য ঝুলে থাকে সীমান্তের  
কাছাকাছিতে। ডোবেনা একেবারেই। তবে এতো গেল বেশিরভাগ স্থানের কথা।  
দেশটির বাকী সব জায়গাগুলোতে এ সময় টানা ২০ ঘন্টা সূর্যের তাপ পুরোদমে  
থাকে আকাশে ( হ্যালো ট্র্যাভেল )। আর উত্তর নরওয়ে? ওখানে সূর্যটা ডোবে  
কখন সেটাই চিন্তার বিষয়। সারাটা সময় ফকফকা সূর্যের  
আলোতে চকমকে হয়ে থাকে পুরোটা দেশ।

## ২. ইনুভিক

কানাডার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত ইনুভিক নামে সবার কাছে পরিচিত স্থানটি। তবে  
তার চাইতেও আরো বেশি পরিচিত এর গরমকালের আবহাওয়ার জন্যে। ঘুরতে  
যদি যেতে চান কোথাও তাহলে আপনার জন্যে নরওয়ের পরপরই তালিকায় দ্বিতীয়  
স্থানে থাকতে পারে এই স্থানটি। ইনুভিকে গরমের সময়ে টানা ৫০ দিন ধরে সূর্য  
আকাশের কোলে আটকে থাকে শক্তভাবে ( হ্যালো ট্র্যাভেল )। টেনেও তাকে  
নামানো যায়না। আর তাই খুব কম সময়েই এখানকার সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখে  
ফেলা যায় সহজেই!

## ৩. সুইডেন

অন্যান্য সূর্য না ডোবা দেশগুলোর তুলনায় একটু বেশি উষ্ণ সুইডেনে সূর্য ডোবে



একদম মাঝরাতে। আবার জেগেও ওঠে ভোর ৪.৩০ এ। আর প্রতি বছরের মে মাস থেকে শুরু করে আগস্টের শেষ অব্দি এমনটা চলতে থাকে এখানে ( আইডিভা )। তোর আর দেরী কেন? এক্ষুণি সময় বের করে নিন আর লম্বা একটা দিনকে উপভোগ করে আসুন সুইডেন থেকে।

## ৪. আলাস্কা

মে মাসের শেষ থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত কখনোই সূর্য ডোবেনা আলাস্কায়। এছাড়া বছরের বাকি সময়গুলোতে কঠিন একটা অন্ধকারময় আর শীতল সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয় একে। উঁচু উঁচু পাহাড়, জমাট বরফ, তিমি দেখাসহ বিনোদনের কোন মাধ্যমটি নেই এখানে? একবার ভাবুন তো মাঝরাতে কেমন লাগবে আপনার যখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পাহাড়ের মাথায় তুষারকে রোদে চকমক করতে দেখবেন আপনি?

উপরের সবগুলো অঞ্চলই পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত। কোনটা একদম বরাবর উত্তরে, কোনটা উত্তর পশ্চিমে আর কোনটা উত্তর পূর্বে। তাই এসব অঞ্চলে এরকম হয়ে থাকে। আবার এসব অঞ্চলে মিডনাইট সানও দেখা যায়। সূর্যের মূল গতিপথ হলো মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ। তাই মধ্যপ্রাচ্যের আশেপাশের অঞ্চলগুলো ছাড়া অন্যান্য দিক গুলোতে এমন তারতম্য দেখা যায়।

## সূর্য গতিশীল

সুরা ইয়াসীন, আয়াত ৩৮।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

“সূর্য তার গন্তব্যের দিকে গতিময় আছে”

\* সূর্য পৃথিবীর সাপেক্ষ ঘোরে:

إِذَا غَرَبَت تَّقَرُّضُهُمْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ  
ذَاتَ الشَّمَالِ

"আপনি দেখবেন যে সূর্য উদয়কালে ডানদিক থেকে তাদের গুহার দিকে হেলে পড়ে  
এবং যখন অস্ত যায় তখন বামদিক থেকে তাদের পাশ কেটে যায়" (সূরা কাহফ,  
আয়াত ১৭)

[https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post\\_5.html](https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html)

ষ্টার ট্রেইলস:

উত্তর গোলার্ধ থেকে, তারাগুলি আকাশের উত্তর মেরুতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে  
চলে আসে; তবে আপনি যদি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের কোনও স্থানে দাঁড়িয়ে  
থাকেন, তারকারা আকাশের দক্ষিণ মেরুতে ঘড়ির কাঁটার দিকে এগিয়ে চলেছে।

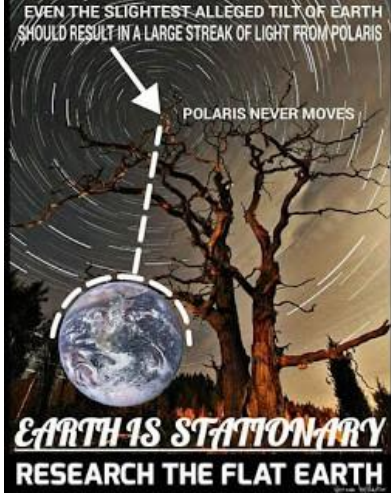
তারকারাজি প্রচলিত বিজ্ঞানের ভ্রান্ত তত্ত্বানুযায়ী কাল্পনিক মহাশূন্যের এদিক ওদিক

অনন্তের দিকে ছুটছে না।

বরং এরা এই পৃথিবী তথা প্রথম জমিনের কে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরছে।

ক্যামেরার লং এক্সপোজারের ছবিতে তারকাদের ট্রেইলকে চমৎকারভাবে দেখা

যায়।



হেলিওসেন্ট্রিস্টদের ব্যাখ্যা হচ্ছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে এইরূপ ট্রেইল দেখা যায়! তাদের কথা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ পৃথিবী যদি সত্যিই ঘুরে তাহলে পোলারিস স্টার বা নর্থ স্টারকে (একদম মাঝের বিন্দুতে অবস্থানকারী তারকা) সারাজীবন স্থিরভাবে ওখানেই দেখা যায়? পৃথিবীর সামান্য মুভমেন্টেই তো এই তারকাকে ওই স্থানে আর পাওয়া যেত না। এটা প্রমাণ করে পৃথিবী স্থির, এবং সমস্ত চলমান তারকা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ জিওসেন্ট্রিসিটি তারকাদের এই চক্রাকারে পৃথিবী কেন্দ্রিক ঘূর্ণন আকাশের গম্বুজ আকৃতিকেও প্রকাশ করে।

<https://youtu.be/ahNfU7zYImY>

সর্বোপরি, পৃথিবী এ কারনেই স্থির যে, কন্সটেলেশন চিরকাল ধরে অপরিবর্তিত হয়ে আছে। হাজার বছর ধরে সকল তারকারা একই কক্ষপথে চলছে এবং স্থির আছে, প্রসিদ্ধ কোন তারকাই হারিয়ে যায়নি। অথচ প্রতিষ্ঠিত কসমোলজি আমাদের বলে, সূর্য পৃথিবী সহ গ্রহদের নিয়ে মহাশূন্যের অজানা গন্তব্যে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলো যে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, সেটা খুবই স্পষ্ট উপলব্ধি।



জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি[নক্ষত্রমালা]

[https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post\\_49.html](https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_49.html)

for more:

[https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post\\_76.html](https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_76.html)

[https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/wandering-stars\\_10.html](https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/wandering-stars_10.html)

[https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post\\_7.html](https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post_7.html)

### অরোরা লাইট:

অরোরা বা মেরুজ্যোতির নাম আমরা সবাই শুনেছি, কিন্তু তা সৃষ্টি হওয়ার

রহস্য হয়তো আমাদের মাঝে অনেকেরই জানা নেই।

অরোরা হলো মেরু অঞ্চলের আকাশে দৃশ্যমান অত্যন্ত মনোরম এবং বাহারী

আলোকছটা যাকে এক সময় অতিপ্রাকৃতিক বলে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে

তা নিতান্তই প্রাকৃতিক ঘটনা বলে প্রমাণিত।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, বায়ুমন্ডলের থার্মোস্ফিয়ারে থাকা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার থেকে আসা চার্জিত কণিকাসমূহের (প্রধানত ইলেক্ট্রন, কিছু ক্ষেত্রে প্রোটন) সংঘর্ষের ফলেই অরোরা তৈরী হয়। সংঘর্ষের কারণে পরমাণু বা অণুসমূহ কিছু শক্তি লাভ করে চার্জিত কণিকাসমূহের কাছ থেকে যা অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে সঞ্চিত হয়। এসব অভ্যন্তরীণ শক্তি যখন আলোকশক্তি হিসেবে বিকিরিত হয়, তখনই মেরুজ্যোতি দেখা যায়।



উত্তর অক্ষাংশে অরোরা সুমেরুজ্যোতি বা সুমেরুপ্রভা (*Aurora Borealis/The Northern Light*) নামে পরিচিত, এবং দক্ষিণ অক্ষাংশে একে বলা হয় *Aurora Australis* (or *The Southern Light*).

অরোরার সবচেয়ে পরিচিত রঙ যা অধিকাংশ সময় দেখা যায় তা হলো সবুজাভ-হলুদ, তার জন্য দায়ী অক্সিজেন পরমাণু। অক্সিজেন থেকে অনেকক্ষেত্রে লাল রঙ এর অরোরাও তৈরী হয়। নাইট্রোজেন সাধারণত একটি নীল রঙের আলো দেয়।

অরোরা দর্শনের সবচেয়ে ভালো স্থান হলো আলাস্কা, কানাডা, এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু অঞ্চল। এসব স্থানে প্রায় নিয়মিতই মেরুজ্যোতি চোখে পড়ে। তবে মেরুপ্রভা সূর্যালোক থেকে অনেক ম্লান হওয়ায়, তা পৃথিবী থেকে দিনের বেলায় দেখা যায় না।

এছাড়াও কানাডিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরসীমায় সাধারণত বছরে কয়েক বার অরোরা দেখা যায়।

কিছু দুর্লভ মুহূর্তে, হয়তো প্রতি দশকে একবার, ফ্লোরিডাতে কিংবা সুদূর দক্ষিণে জাপানেও অরোরা দৃশ্যময়ান হয়।

অরোরা লাইট একটি প্রাকৃতিক বিষয়। রংধনুর মতোই আল্লাহর আরেকটি বিশেষ কুদরত। প্রচলিত বিজ্ঞান যেই ব্যাখ্যায় দেক না কেন, আমরা মনে করি এটা আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন, যা দিয়ে বান্দাকে নিজের প্রভুর বড়ত্ব ও সৌন্দর্যতাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়। এরকম অসংখ্য প্রাকৃতিক রহস্য আছে। সব তো উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। আর সবকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার পিছনে সময় নষ্ট করাও বোকামি।

নর্থ ও সাউথ পোল, স্টার ট্রেইলস, অরোরা লাইট, আলাস্কা সহ আরো কিছু বিষয় দিয়ে অনেক ভাই সমতলে বিছানো পৃথিবীকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। যারা পুরো লিখাটি ভালো করে পড়েছেন তারা খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে, এগুলো দিয়ে ওই প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সমতলে বিছানো পৃথিবীতে এগুলো কিভাবে হয়, এ ব্যাপারে আশা করি আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব পাঠকের মধ্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তর গুলোকে পরিচ্ছন্ন করে দিন। আমিন।

বিঃদ্রঃ বিভিন্ন Blog, Page & Newspaper থেকে লিখা গুলো নেয়া হয়েছে। সাথে প্রয়োজন মতো সংযোজন করে পরিমার্জিত করা হয়েছে।

## রাশিয়া কেন আলাস্কা বিক্রয় করেছিলো? এবং সমতল পৃথিবীতে এসবের

### ব্যাখ্যা:

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা পরাশক্তি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি স্থলজ আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ যার আয়তন ৯৮,২৬,৬৭৫ বর্গকিলোমিটার। একটি ফেডারেল জেলা ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া (District of Columbia) ও ৫০ টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত এই বিশাল আয়তনের দেশ আমেরিকার সবচেয়ে বড় অঙ্গরাজ্যটি হলো আলাস্কা যার আয়তন ৫,৮৬,৪১২ বর্গকিলোমিটার। ১৯৬৭ সালে আমেরিকা ক্রয়ের পূর্বে এই বিশাল ভূখন্ড রাশিয়ার অর্ন্তভূক্ত ছিলো। রাশিয়া ও আলাস্কার মাঝে বেরিং প্রণালী অবস্থিত। আলিউট আলিয়েস্কা ভাষা হতে আলাস্কা শব্দটি নেয়া যার অর্থ বিশাল বা মহান দেশ বা

ভূখন্ড। চলুন জেনে নেই ঠিক কি কারণে রাশিয়াকে আলাস্কা বিক্রয় করতে হয়েছিল।

### আলাস্কা বিক্রির কারণ

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত দারদানেলিস প্রণালী দিয়ে যুদ্ধ জাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষার অজুহাতে তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কি এলাকায় রাশিয়া আক্রমণ চালায় যার ফলাফল হিসেবে ক্রিমিয়ার (বর্তমানে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত) যুদ্ধের সূচনা। এই যুদ্ধে রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষ শক্তি ছিলো ফ্রান্স, ব্রিটেন ও তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্য। তিন বছর ব্যাপি চলমান এই যুদ্ধে রাশিয়া ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে রাশিয়ার সাথে মিত্রবাহিনীর এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অনুসারে রাশিয়া তাদের অধিকৃত কিছু এলাকা তুরস্কের হাতে ছেড়ে দেয়। এই সময় অন্যান্য দেশের যুদ্ধ জাহাজের মতো রাশিয়ার যুদ্ধ জাহাজের ওপরও কৃষ্ণ সাগরে চলাচলে নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। অপরদিকে তুরস্কের খ্রিষ্টানদের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে মৈত্রী দেশগুলো সম্মত হয়। যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে রাশিয়া অর্থনৈতিক ভাবে খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাশিয়ার কাছে প্রচুর পরিমাণে বরফে ঢাকা বনভূমি এবং খুব অল্প পরিমাণ অবশিষ্ট অর্থ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক দৈনন্দিন কাটিয়ে উঠতে রাশিয়ার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিলো। তৎকালীন মূল অর্থনৈতিক পরাশক্তি গুলো রাশিয়ার বিরোধি শিবিরে থাকার



কারণে কোন দেশের নিকট থেকে সহজ শর্তে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়ার রাস্তাটাও ছিলো বন্ধ। এছাড়া যুদ্ধ বিদ্রোহ একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে দূরবর্তী একটি অঙ্গ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা ছিলো কষ্টকর বৈকি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার উপর আবার স্থানীয় উপজাতিগুলি ছিলো অত্যন্ত অপ্রতিরোধ্য। ফলে একাধিক বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও সহিংসতা ঘটার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বিধানগুলো লঙ্ঘনের মতো ঘটনা গুলো ছিলো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে বসবাস এবং জীবন ধারণও সহজতর ছিলো না। তৎকালে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ছিলো প্রকট। সেকারণে রাশিয়াকে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে আলাস্কা বিক্রয়ের চিন্তা করতে বিন্দুমাত্র ভাবতে হয়নি। আবার তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করলেও রাশিয়া যে নিজেদের স্বার্থেই আলাস্কা বিক্রয় করেছিলো একথা পুরোপুরি যুক্তি যুক্ত বলেই মনে হয়।

### বিক্রির প্রস্তাব ও বিক্রি চুক্তি

রাশিয়া প্রথমে ব্রিটিশ এবং পরে আমেরিকাকে আলাস্কা ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানায়। আলাস্কার পাশে অবস্থিত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটি উপনিবেশ থাকা সত্ত্বেও দূর্বল রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কিনে নেয়ার কোন আগ্রহ দেখায়নি কারণ অর্থ অপচয় না করে আলাস্কা দখল তখন তাদের কাছে ইচ্ছা আর সময়ের ব্যাপার ছিলো মাত্র। আবার “ক্যালিফোর্নিয়া **Gold Rush**” থেকে ধারণা করা হয় যদি আলাস্কা তে স্বর্ণ পাওয়া যায় তাহলে হয়তো জোড়পূর্বক আমেরিকা-কানাডা গ্রাস করে ফেলবে এই আলাস্কা। ব্রিটিশ যুদ্ধংদেহী দূরভিসন্ধিমূলক মনোভাব এবং লেজের কাছে কানাডা-আমেরিকার স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে শত্রুর কাছে অঞ্চলটিকে হারানোর চেয়ে কোনো নিরপেক্ষ দেশের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার বিষয়টিই ছিলো রাশিয়ার কাছে সেরা বিকল্প।

তৎকালীন রুশ সম্রাট ২য় আলেকজান্ডার সর্বপ্রথম আমেরিকার কাছে আলাস্কা বিক্রয়ের প্রস্তাব পাঠায়। তবে আমেরিকান গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে ওয়াশিংটন তখন প্রচুর চিন্তিত থাকায় আমেরিকা চুক্তি থেকে বিরত থাকে। পরবর্তীতে রুশ সম্রাটের ছোট ভাই এর চিঠির পর বরফ গলতে থাকে এবং আমেরিকা ১৮৫৯-৬০ সালে দরকষাকষি শুরু করে। একজন সিনেটর আলাস্কা এর মূল্য হিসাবে ৫ মিলিয়ন ডলার প্রস্তাব করেন রাশিয়া কে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস বিউকানান (James Buchanan) এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং আমেরিকান গৃহযুদ্ধকালে তাঁর নেয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে শুরু হয় এবং নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত আমেরিকা আলাস্কা নিয়ে কোন চুক্তি করা থেকে আগের মতোই বিরত থাকে। অন্যদিকে রাশিয়া রথচাইল্ডস (Rothschilds) এর কাছ থেকে বাতসরিক ৫% সুদে যে ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিশুদ্ধ মুদ্রা ধার নিয়েছিলো তা পরিশোধ করতে অপারগ হয় এবং পেরু ও চিলি এর সাথেও বিবাদ শুরু হয়। আমেরিকান গৃহযুদ্ধে “Union” এর সেনাবাহিনী বিজয়ী হয়।

উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি কমে আসার পরে রাশিয়ান সম্রাট আবারো আলাস্কা বিক্রয় বিষয়ে আমেরিকা তে রাজদূত প্রেরণ করেন। রাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম সেওয়ার্ড (William Seward) এর নেতৃত্বে সারারাত ধরে আলোচনা ও দরকষাকষি চলতে থাকে রুশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকার কর্মকর্তাদের মধ্যে। সারারাত আলোচনা শেষে ১৮৬৭ সালের ৩০শে মার্চ, ভোর ৪ টায় মাত্র ৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে আলাস্কা ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অবশেষে ১৮ই অক্টোবর ১৮৬৭ সালে সদ্যবিক্রিত আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আমেরিকান আলাস্কাতে বসবাসরত কয়েক হাজার রাশিয়ান স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও কিছু নাগরিক আলাস্কাতেই থেকে যায়। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমেরিকা অর্থনৈতিক সাফল্যের দেখা পায়। মৎস সম্পদ, পশম বাণিজ্য সীল এর চামড়া ও চামড়া বাণিজ্যের পাশাপাশি আলাস্কাতে প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ (গাছপালা) এবং প্রাণীজ সম্পদের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ গুলোও গুরুত্ব পায়। তাছাড়া আবিষ্কৃত হয় একাধিক **Gold mine** (স্বর্ণখনি) ও তেলকুপ/ তেলের খনি। দেখা যায় আলাস্কাতে কেনার ৫০ বছর পরে আমেরিকানরা ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে প্রায় ১০০গুণ বেশি মূল্য ফেরত পায়।

কাজেই কথতা বলা অধিক যুক্তিযুক্ত তৎকালীন প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার আলাস্কা বিক্রয় সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হলেও ভবিষ্যতের জন্য লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্কটাই বেশি পক্ষান্তরে যা আমেরিকার লাভের পাল্লাকে করেছে অনেক ভারি।



**R:M:** এবার আসুন দেখি সমতলে বিছানো পৃথিবীতে আলাস্কা, আমেরিকা, রাশিয়া ও বেরিং প্রণালীর সম্পর্ক কিভাবে হয়? জাতিসংঘের সমতল পৃথিবীর ম্যাপটি ভালো করে খেয়াল করুন (যদিও আমরা এটাকে চূড়ান্ত ম্যাপ মনে করিনা)। এই অঞ্চলগুলো (আলাস্কা, আমেরিকা, রাশিয়া ও বেরিং প্রণালী) একসাথেই আছে। সুতরাং যারা এটা দিয়ে বলাকার পৃথিবী প্রমানের চেষ্টা করেন, তারা এখনো ভুলের মধ্যেই আছেন। আর যারা এই ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন, আশা করি তাদের কনফিউশন দূর হলো।

---

## ( সমাপ্ত )

আলহামদুলিল্লাহ ২য় খন্ড এখানে শেষ হলো। এরপর ৩য় খন্ডে থাকবে :  
কম্পাস, গ্রাভিটি, নাসার ভণ্ডামি, দাহাহা (উটপাখির ডিম) , কল্প বিজ্ঞান, মুন  
ল্যান্ডিং, গুগল ম্যাপ, স্যাটেলাইট, জিপিএস ইত্যাদির ব্যাবচ্ছেদ এবং প্রশ্ন  
উত্তর সহ আরো অনেক কিছু। ইনশাআল্লাহ।